পুরীতীর্থ।

(সচিত্র)

[উৎকলের পঞ্চতীর্থের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক
বিবরণ এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের
লীলাবলী সম্বলিত।]

আন্দুল রাজষ্টেটের ম্যানেজার
শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত।

কলিকাতা, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি হইতে
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
হাওড়া ১৬নং খুরুট রোড,
বিজয় প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র সরকারের দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২২ সাল।


G.N MUKHERJI

নিবেদন।

পুণ্যভূমি পুরুষোত্তমধাম ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর শ্রেষ্ঠতীর্থ। স্থানীয় পাণ্ডাগণের মধ্যে অধিকাংশই সরলমতি তীর্থযাত্রীগণকে তীর্থ তথ্য সম্বন্ধে যদৃচ্ছা ভুল বুঝাইয়া প্রতারণা করিয়া থাকেন। পুরীধাম এবং জগন্নাথ দেব সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তীর্থ ক্ষেত্রে অল্পদিন অবস্থিতি সময়ে তীর্থস্থানের যাবতীয় তথ্য ও রহস্য অবগত হওয়াও একরূপ অসম্ভব। তাঁহাদিগের অবগতির জন্য "পুরীতীর্থ" লিখিত হইল।

সুহৃদ্বর সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত হরিগোপাল বসু মহাশয় বিশেষ যত্নের সহিত পুস্তকখানির ভাষা আদ্যোপান্ত পরিমার্জ্জিত করিয়া দেওয়ায় আমি ইহা জনসমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। ইহার প্রথমাংশ 'সুধী' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার সমালোচনায় "হিতবাদী" লিখিয়াছিলেন "পুরীতীর্থ বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে।"

পুরী জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত পূজ্যপাদ বঙ্গভাষাভিজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র কাব্যকণ্ঠ মহাশয় পুস্তকখানির প্রণয়ন ব্যাপারে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির" নামক পুস্তক হইতে আমি যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। পুরী সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বঙ্গভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মিশ্র তর্কসাংখ্য ন্যায়তীর্থ মহোদয় পুস্তক-বর্ণিত নানা বিষয় সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য অবগত করাইয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন।

কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ ইটালী পল্লীর স্বনামখ্যাত ৺দেবনারায়ণ দেব মহাশয়ের সুযোগ্য প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ দেব মহাশয় এবং তদীয় ভ্রাতৃগণ শ্রীমন্দির, ভুবনেশ্বর, কোণার্ক প্রভৃতির ফটোগ্রাফগুলি প্রদান করিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থকার এবং বন্ধুর নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

পুস্তকখানি যদি তীর্থযাত্রিগণের এবং জনসাধারণের মনোজ্ঞ হয়, শ্রম সফল জ্ঞানে অসীম তৃপ্তি ও অনাবিল আত্মপ্রসাদ লাভ করিব। ইতি—

শিবপুর,
সন ১৩২২ সাল, ২৮শে পৌষ। } শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র।

পূজা।

ওঁকার-মূর্ত্তি

দেবাদিদেব

জগন্নাথ দেবের

শ্রীচরণ কমলে

"পুরীতীর্থ"

অর্পিত হইল।

সেবক—

নগেন্দ্র।

পুরী তীর্থ।

প্রথম অধ্যায়।

"সর্ব্বেষাং চৈব ক্ষেত্রাণাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমম্।
সর্ব্বেষাং চৈব দেবাণাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমঃ॥"

কপিল সংহিতা।

উড়িষ্যা।—ইহা সংস্কৃত 'ওড্র' শব্দের অপভ্রংশ। মহাভারত, রামায়ণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরিবংশের মতে প্রদ্যুম্ন রাজার পুত্র উৎকল এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'উৎকল' হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, কলিঙ্গ দেশের উত্তর অংশ 'উত্তর কলিঙ্গ' বা সংক্ষেপতঃ 'উৎকল' নামে অভিহিত হইত।

আইন-ই-আকবরী নামধেয় গ্রন্থের বর্ণিত বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে পুরাকালে উড়িষ্যা মেদিনীপুর হইতে রাজমাহেন্দ্রী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে ইহা মেদিনীপুরের দক্ষিণ হইতে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তিনটি জেলা ইহার অন্তর্ভুক্ত :—কটক, বালেশ্বর ও পুরী; সম্প্রতি উহাদিগের সহিত সম্বলপুর সংযুক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন 'গড়জাত' নামে খ্যাত, আঙ্গুল, দশপালা, ধেঙ্কানল, হিন্দোল, কিয়ঞ্ঝড়, ময়ুরভঞ্জ, নীলগিরি প্রভৃতি অর্দ্ধস্বাধীন করদ রাজ্য উহার সহিত সন্নিবিষ্ট। করদ রাজগণের উপর দেওয়ানি কার্য্য বিষয়ক সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পিত আছে, কেবল ফৌজদারী কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের অতিরিক্ত শাস্তি দিবার অধিকার নাই। উড়িষ্যার কমিশনার সাহেব বাহাদুর এই সকল

করদ রাজ্যের প্রধান তত্ত্বাবধারক; তিনিই অপেক্ষাকৃত জটিলতর ফৌজদারী মোকর্দ্দমা গুলির বিচার কার্য্য সম্পাদন করেন এবং রাজগণ যাহাতে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত না হন সে বিষয়ে বিশেষদৃষ্টি রাখিয়া থাকেন।

উৎকল খণ্ডে লিখিত আছে—"উৎকল নামে একটি পরম পবিত্র বিখ্যাত দেশ আছে, তাহাতে অনেক তীর্থও পুণ্যস্থান বর্ত্তমান। তত্রত্য জনগণ সদাচার, বৈষ্ণবধর্ম্ম-পরায়ণ, সত্যবাদী, মাতৃপিতৃভক্ত ও বিনয়ী; ব্রাহ্মণগণ বেদজ্ঞ; রমণীগণ পতিপরায়ণা, সুশীলা ও লজ্জাশীলা; ক্ষত্রিয়গণ ধার্ম্মিক, দানশীল ও অস্ত্রবিদ্যানিপুণ; বৈশ্যগণ কৃষি ও বাণিজ্যে নিরত; শূদ্রগণ ধর্ম্মপরায়ণ; সকলেই সঙ্গীত ও শিল্পবিদ্যানিপুণ; সেখানে কখনই শস্যহানি, অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও বিপ্লবের সঞ্চার নাই।"

কপিল সংহিতার মতে উৎকলের ন্যায় পুণ্যভূমি জগতে আর নাই—

"বর্ষাণাং ভারতঃ শ্রেষ্ঠঃ দেশানাৎকলঃ শ্রুতঃ।
উৎকলস্য সমো দেশো দেশো নাস্তি মহীতলে॥"

দুঃখের বিষয় প্রাগুক্ত বর্ণনাগুলি বর্ত্তমান সময়ে যেন স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই!

কপিল-সংহিতায় লিখিত আছে উৎকলের মধ্যে চারিটী পুণ্যক্ষেত্র বিদ্যমান আছে; যথা, শাক্তদিগের বিরজাক্ষেত্র, শৈবদিগের শাম্ভবক্ষেত্র, সূর্য্য-উপাসকদিগের পদ্মক্ষেত্র ও বৈষ্ণবদিগের পুরুষোত্তমক্ষেত্র। যাজপুর বিরজাক্ষেত্র, পার্ব্বতীক্ষেত্র বা গদাক্ষেত্র; ভুবনেশ্বর শাম্ভবক্ষেত্র বা চক্রক্ষেত্র, কোণার্ক পদ্মক্ষেত্র বা অর্কতীর্থ; এবং পুরী পুরুষোত্তমক্ষেত্র বা শঙ্খক্ষেত্র। ভগবান বিষ্ণু গয়াসুরকে নিহত করিয়া, উৎকলে তাহার শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম পরিত্যাগ করিয়া যান; পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলির নামানুসারে প্রত্যেক তীর্থের নাম আখ্যাত হইয়াছে।

এই চারিটী ক্ষেত্রের সহিত, ধানমণ্ডল ষ্টেসন হইতে চারি মাইল ব্যবধানস্থ গণপতিতীর্থ বা মহাবিনায়ক তীর্থের সংলগ্নে 'উড়িষ্যায় পঞ্চতীর্থ' নামে অভিহিত করা হয়।

"বিরজা ক্ষেত্রমেকাম্রং কোণার্কং পুরুষোত্তমম্।
সিদ্ধিস্থানং মুমুক্ষাণাং মতাঃ সোপানপংক্তয়ঃ॥"

যাহারা মুক্তিপ্রার্থী, তাহাদের পক্ষে বিরজা, একাম্র, কোণার্ক ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র সিদ্ধিস্থানে আরোহণ বিষয়ে সোপান বিশেষ অবগত হইবে।

রেলওয়ে ও রাস্তা—গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন ও পুরী এই পাঁচটী ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর মহাতীর্থ স্থান। প্রথম চারিটী স্থানে গভর্ণমেণ্ট-কার্য্যার্থে অনেকদিন পূর্ব্বেই রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু পুরী যাইবার পথে নিম্নলিখিত সুদুস্তর নদীগুলি বিদ্যমান থাকায় রেলপথ বহু বিলম্বে সংঘটিত হইয়াছে।

দামোদর,	বৈতরণী
রূপনারায়ণ,	ব্রাহ্মণী,
কংসাবতী (কাঁসাই)	বিরূপাক্ষ, (বিরূপা)
সুবর্ণরেখা	মহানদী
বুড়াবলং	কাটজুড়ী,
শালিন্দী	কোয়াখাই,

রেলপথ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে স্থলপথে পুরী যাইতে ন্যূনাধিক এক মাস সময়ের আবশ্যকতা হইত, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রেলপথ-সুগমতায় উক্ত সুদূর ব্যবধানময় পথ অতিক্রম করিতে রেলপথে দশঘণ্টার অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না!

কলিকাতা হইতে বজ্ বজ্, উলুবেড়িয়া বালেশ্বর, ভদ্রক, টাঙ্গি, ছাতিয়া, চাউলিয়া গঞ্জ (কটক), ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া একটী রাজবর্ত্ম পুরী পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে; উক্ত বর্ত্মটী পুরী বা জগন্নাথ রোড্ নামে অভিহিত। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা বড়ইগৌরবের বিষয় যে ৬৫২ মাইল বিস্তৃত এই বিশাল রাজবর্ত্মটী, কলিকাতা পোস্তার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজা সুখময় রায় মহানুভবের ব্যয়ে নির্ম্মিত। ইনি মাতামহ ৺লোকনাথ ধরের অতুল বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া যথেষ্ট সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদানীন্তন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রয়োজনানুরোধে অনেক সময়ে তাঁহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং পুরীধাম গমন উপলক্ষে তীর্থযাত্রীগণের কষ্ট দর্শন করিয়া দেড় লক্ষ টাকা

ব্যয়ে এই বিশাল-বর্ত্ম নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। (১) মার্কুইস অব হেষ্টিংস মহানুভব সুখময় রায়কে তাঁহার এই কীর্ত্তির পুরস্কার স্বরূপ মহারাজা বাহাদুর উপাধি ও একটী স্বর্ণ মেডেল দান করিয়াছিলেন। কিন্তু নিরতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে জনসাধারণ তাঁহার এই অতুল কীর্ত্তির বিষয় আদৌ অবগত নহে। পুরী হইতে দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী সেতুর উপরস্থ একখানি শিলাখণ্ডে পারসী, হিন্দি, বাঙ্গালা, ও সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ লিখিত আছে—

'কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মহারাজা সুখময় রায়, এই রাস্তা ও তদুপরিস্থ পুল সকল নির্ম্মাণার্থে দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দানের স্মরণার্থে এই শিলাখণ্ড বড়লাট সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত হইল; খ্রীঃ অব্দ ১৮২৬।"

আর একটী বিশাল রাজপথ কটক হইতে খুর্দ্দার ভিতর দিয়া গাঞ্জাম ও মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। খুর্দ্দা হইতে পুরী পর্য্যন্ত আরও একটী রাস্তা আছে।

দেশের কথা—তীর্থযাত্রা উপলক্ষে দুই চারি দিনের জন্য পুরীতে বা ভুবনেশ্বরে গমন করিয়া অশিক্ষিত কুলি, দোকানদার, মজুর, বা সাধারণ অর্থলোভী পাণ্ডাগণের ব্যবহার দেখিয়া সমগ্র জাতি সম্বন্ধে একটা অসঙ্গত মত প্রকাশ করা বিধেয় নহে। বঙ্গদেশে যাহারা চাকুরির উদ্দেশে আগমন করে তাহারা সাধারণতঃ নীচজাতীয় অথবা নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থার লোক; সুতরাং মাত্র তাহাদের আচার ব্যবহার দর্শনে সমস্ত উৎকল বাসীর উপর কোনরূপ বিরুদ্ধ ধারণার পোষণ করা কর্ত্তব্য বা সমীচীন নহে। বিষয় মাত্রেরই ভাল এবং মন্দ দুইটা দিক আছে এবং প্রকৃত পক্ষে উড়িষ্যাবাসীগণের এমন অনেক গুণ আছে যাহা আমাদের সর্ব্বথা অনুকরণীয় হইতে পারে। আধুনিক উৎকল-বাসীরা অত্যন্ত নিঃস্ব হইলেও, শ্রীক্ষেত্র, কোণার্ক ও ভুবনেশ্বরের সজীব কীর্ত্তি সমূহ তাহাদিগকে আজিও তাহাদের পূর্ব্বতন গৌরব হইতে স্খলিত করে নাই।(১) যদি কেহ উৎকলবাসীদিগের অসাধারণ

(১)"The Cuttuck Road was commenced in 1811 originally in a bequat of Rs. 1,50,000 by Raja Sukhmoy Roy whose object was to facilitate communication with Jagannath," Calcutta Gazette 1835, Feb., 7.

বুদ্ধিশক্তি ও মনোজ্ঞ শিল্প-কুশলতার বিশেষ পরিচয় লাভ করিতে ইচ্ছুক হয়েন, উপরোক্ত মন্দিরত্রয়ের অসামান্য কারুকার্য্য স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে তাঁহাকে অনুরোধ করি। চত্বারিংশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের যে অবস্থা ছিল, উড়িষ্যার বর্ত্তমান অবস্থা বহু পরিমাণে তদনুরূপ। রেল বিস্তার ও শিক্ষা প্রচারের ব্যাপারে ঔদাসীন্যই যে এবম্বিধ অবস্থা—বৈষম্যের মুখ্য হেতু তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অসংখ্য বাঙ্গালা গ্রন্থে উড়িষ্যাবাসী-গণের কলঙ্ক রটনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অবশ্য শিষ্টাচার সম্মত নহে। অন্যান্য জাতির ন্যায় তাহারাও কোনও না কোনও দোষস্পর্শ-যুক্ত; তাহা-দিগকে এ অবস্থায় অযথা নিন্দা না করিয়া সরল ভাবে সৎপথে আনয়ন করার পক্ষেই সচেষ্ট হওয়া উচিত। সম্প্রতি কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে উড়িয়াগণ মনুষ্যপদবাচ্য হইয়াছে, ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা, তাহারা মিথ্যাবাদী ও লম্পট; তাহাদের মস্তকে কতকগুলি কেশগুচ্ছ থাকায়, তাহারা কিস্কিন্ধার বংশ বলিয়া গর্ব্ব করে, অর্থাৎ পুচ্ছ ক্রমে মস্তকে আসিয়া উঠিয়াছে।" উহাদের সম্বন্ধে এরূপ মর্ম্মান্তিক মন্তব্য প্রকাশ শিষ্টাচার সম্মত কি? ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশে স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তারই হৃদয়ের সংকীর্ণতা প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। Macaulay সাহেব অজ্ঞতাবশতঃই হউক বা বিদ্বেষ-বুদ্ধি পরতন্ত্রতা হেতু-তেই হউক সমগ্র বাঙ্গালী জাতির যে নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও প্রত্যেক বাঙ্গালীর মর্ম্মদেশ দুঃখে বিদীর্ণ হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে বাঙ্গালী গ্রন্থকার যে অন্য জাতির নিন্দা করিতে তিল মাত্র সঙ্কুচিত নহেন ইহাই যারপর নাই দুঃখের বিষয়! আমরা অত্যন্ত গর্ব্বিত জাতি; আপনাদিগকে অত্যন্ত উন্নত ও অপর জাতিকে নিতান্ত নিকৃষ্ট মনে করাই আমাদের স্বভাব। এমন এক সময় ছিল যে সময় বিহার ও উৎকল-বাসীগণ আমাদিগকে বিশেষ ভক্তির চক্ষে দেখিতেন কিন্তু এক্ষণে আমরা আমাদের অর্ব্বাচীনতা-দোষে আমাদের প্রাপ্য সেই সম্মান লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি! বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই যে চতুর্দ্দিকে (anti-Bengali feel-ing) বাঙ্গালীর প্রতি বিদ্বেষ সঞ্চার, অপর জাতির প্রতি আমাদের অযথা আত্মাভিমান পূরিত ব্যবহারই তাহার মূল হেতু। আমরা অন্য জাতির

প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিব, তাহারা আমাদের প্রতি যে তদনুরূপ ব্যবহার করিবে ইহা আদৌ বিস্ময়ের ব্যাপার নহে।ইদানীন্তন সময়ে সংকীর্ণমনা এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল নহে যাহারা বঙ্গ ও উড়িষ্যা এই উভয় দেশবাসীর প্রতি যাহাতে ব্যবহার-বৈষম্যের সঞ্চার হয় সে পক্ষে প্রয়াস পাইতে আদৌ উদাসীন নহেন। কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ ভাব ও চেষ্টার বিকাশ দৃষ্টি-গোচর হইত না। রাজা প্রতাপ রুদ্রের ন্যায় উড়িষ্যার নরপতি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ন্যায় মনীষি বাঙ্গালী পণ্ডিতকে বিশেষ সমাদর সহকারে স্বকীয় সভাপণ্ডিত পদে বরণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালীগণ বর্ত্তমান কালে উড়িষ্যাবাসীগণকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের সেই সঙ্গে ইহাও জানা উচিত যে বাঙ্গালা দেশ দাসত্ব-নিগড়বদ্ধ হইবার সার্দ্ধ তিন শত বৎসরের পরবর্ত্তী সময় উড়িষ্যার ভাগ্যলক্ষ্মী পরাধীনতার কাল-কবল-গত হইয়াছিল। উড়িষ্যাবাসীগণ পূর্ব্ব-কালে শৌর্য্যবীর্য্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে বাঙ্গালী অপেক্ষা যে সর্ব্ববিষয়ে শীর্ষ-স্থানীয় ছিল ইতিহাসই তাহার সাক্ষী।

বিশুদ্ধ উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্যতীত উৎকলে আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; গাড়ী চালান, মোট বহন ও হল কর্ষণ তাহা-দের জাতীয় ব্যবসা। উহারা বলভদ্র গোত্রীয় 'শওর' নামে অভিহিত হয়। ইহাদিগকে দেখিয়াই জন সাধারণের ধারণা হয় যে উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ মাত্রেই শকট চালক ও মোট বাহক, কিন্তু তাহা নহে।

ব্রাহ্মণ জাতির নিম্নেই করণ বা মহান্তি জাতি। ইহাদিগের মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই বিবাহের পরে কন্যা শ্বশুরালয়ে গমন করিলে পুনরায় পিত্রালয়ে আসিবার অধিকার নাই; পক্ষান্তরে শ্বশুরালয়ে আগমন সম্বন্ধে জামাতার পক্ষেও ঐ নিয়ম। এই জন্যই উড়িষ্যার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে—"যমে লওয়া এবং জুঁইয়ে (জামাই) লওয়া সমান।" কন্যাকে পিত্রালয়ে অথবা জামাতাকে শ্বশুরালয়ে আনিতে হইলে অপরিমিত অর্থব্যয় করিতে হয়, কিন্তু তাহা সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে।

ব্রাহ্মণেতর জাতির বিবাহ কার্য্য ঠিক লগ্ন সময়ে সম্পন্ন হয় না। বিবাহ কার্য্য সাধারণতঃ অতি প্রত্যুষে অথবা প্রাতঃকালে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বরযাত্রীগণ বিবাহের রাত্রে কন্যাকর্ত্তার বাটিতে আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন না। কিন্তু অপর স্থানে বসিয়া তাঁহার প্রেরিত আহার্য্য সামগ্রী-সম্ভারের ব্যবহার পক্ষে তিল মাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। বিবাহের পরবর্ত্তী দিবসে কন্যাকর্ত্তার আবাসে বরযাত্রীগণের আহারাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিবাহ সভায় সর্ব্বাগ্রে ভাগবৎ পাঠ হইয়া 'ভোগ' দেওয়া হয়। অনন্তর মহাপ্রসাদ বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হয়। বিবাহের পরে যে কন্যাকর্ত্তা কন্যার সহিত যে পরিমাণে দাসী পাঠাইতে পারেন তাঁহার যশ ও ঠিক সেই পরিমাণে হইয়া থাকে; দাসীগুলি সাধাণতঃ কন্যায় সমবয়স্কা এবং কন্যার সংসারে আজীবন অতিবাহিত করে! কন্যার স্বামীর ঔরসে ঐ সকল দাসীর গর্ভে যে সকল সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তাহারা দাসীপুত্র বা 'সাগর পেষা' নামে এক স্বতন্ত্র জাতি রূপে পরিণত হইয়া থাকে। সুখের বিষয় যশোলাভের উল্লিখিত রূপ উৎকট লালসা ক্রমশঃই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে! উড়িষ্যার বিবাহ রাত্রে রিকাহ ব্যাপার অন্তে বঙ্গের ন্যায় 'বাসর' প্রথার প্রচলন নাই!

করণদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথার প্রচলন নাই। খণ্ডাইত বা 'তসা' (চাসা) এবং 'পধান' জাতির মধ্যে উহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পরে সাধারণতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতাই তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া থাকে!

"ন দোষো মগধে মন্থে অন্নযোন্যোঃ কলিঙ্গজে।
ওড্রে ভ্রাতৃবধূ ভোগে দক্ষিণে মাতুল কণ্যকা।"

পরাশর।

উড়িষ্যা ভাষায় বিধবা বিবাহকে "কাঁচখড়া" বা 'দ্বিতীয়া' কহে। খণ্ডাইত ধনশালী হইয়া 'করণের' গৃহে কন্যার আদান প্রদান করিয়া 'করণ' হইতে পারে!

মহারাণা বা বড়ই (ছুতার), কাঁসারী, গুড়িয়া, (ময়রা), ভাণ্ডারী (নাপিত), তান্তী (তাঁতী), প্রভৃতি আরও অনেক জাতি আছে! পান

(মুচি), ধোবা, কণ্ডা প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতি অপেক্ষা-কৃত উচ্চতর জাতির গৃহে পর্য্যন্ত যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হয় না! পান্ বা রজক কর্তৃক প্রহৃত বা অবমানিত হইলে উচ্চশ্রেণীর লোকের জাতিচ্যুতি ঘটে এবং সে অবস্থায় সে বিনা প্রায়শ্চিত্তে স্বজাতি মধ্যে আহারাদি করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় না! জ্যোৎসী (জ্যোতিষী) নামে এক স্বতন্ত্র জাতি আছে, তাহারা কেবল কোষ্ঠী আদি প্রস্তুত ও বিচার করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে; তাহারা ব্রাহ্মণ নহে! মাদক দ্রব্য সেবনে জাতিচ্যুতি ঘটে; এমন কি যে খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে তাড়ি বাহির করিয়া লওয়া হও, তাহা স্পর্শ পর্যান্ত করা নিষেধ! মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে এই কঠোর নিয়ম সকলেরই অনুকরণীয়। উচ্চশ্রেণীর জাতির স্ত্রীলোকগণের মধ্যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে! চিরন্তর প্রথা অনুসারে স্বামীকে কর্ম্মস্থানে কার্য্যসূত্রে আজীবন অতিবাহিত করিতে হইলেও স্ত্রীকে তথায় লইয়া যাইবার প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই! স্ত্রীলোকগণ পুরুষের মত কাছা দিয়া বসন পরিধান করে; তাহাদের পরিধেয় সাড়ীগুলি দৈর্ঘে দ্বাদশ হস্ত, অতিশয় স্থূল, কিন্তু তাহার বিস্তৃতি পরিসর এত অল্প যে পরিধান মাত্রেই জানুর সীমা কখন অতিক্রম করে না! দেখিতে তাহা যে বেশ সুন্দর তাহাও নহে। কিন্তু ইহা পক্ষান্তরে অবশ্যই স্বীকার্য্য যে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের 'বেআবরু' বসন পরিধানের তুলনায় উড়িষ্যাবাসীর উক্ত প্রথা সহস্রাংশে শ্লীলতাদ্যোতক। উৎকলের স্ত্রীলোকগণের শিরস্থ কবরী মস্তকের সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ উচ্চ! এই জন্যই উহাদের পরিধেয় বসন সাধারণতঃ একটু দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। উহারা সাধারণতঃ কাংস, পিত্তল ও দস্তার নির্ম্মিত গহনা ব্যবহার করে; কেবল অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থাপন্ন লোক রূপার গহনা প্রস্তুত করাইয়া থাকে। উহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ তাহার স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না! ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতির কণ্ঠদেশে কাঠের মালা বিলম্বিত থাকে এবং কোনরূপে উহা ছিন্ন হইয়া যাইলে উহার স্থানে যতক্ষণ না নূতন মালা ব্যবহৃত হয় ততক্ষণ অন্ততঃ এক গাছি তৃণও কণ্ঠদেশে বেষ্টিত করিয়া রাখিতে হয়। উড়িষ্যায় পোষ্যপুত্র গ্রহণ প্রথার কিছু অতিরিক্ত আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

অধিকাংশ উড়িষ্যাবাসীর নিকটে একটী করিয়া ক্ষুদ্র আকারের থলিয়া ও তাহাতে কতকগুলি পান, গুয়া (সুপারি) গুণ্ডী (ধনের চাউল ভাজা ও দোক্তা ভাজা) ও একখানি গুয়াকাতী (জাঁতী) থাকে; উক্ত থলিয়াটির নাম 'বটুয়া'। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারেই এক একখানি তালপত্রে লিখিত ভাগবত আছে, উৎকলবাসী প্রত্যহই ভক্তিভরে তাহার পূজা করে। অধিকাংশ উড়িষ্যাবাসীর মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে দীর্ঘ কেশ রাশির বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সম্মুখ ভাগে কেশ রক্ষার ব্যবস্থা নাই এবং উহাদের কর্ণ ও ললাটদেশ স্নানান্তে নিত্য তিলক-লাঞ্ছিত হয়। প্রতিগ্রামে এক একটী সাধারণ "ভাগবত ঘর" আছে। ভাগবত ঘরে অধিক অর্থব্যয় হয় না; প্রদীপের আলোক উদ্দেশে পুন্নাগ গাছের তৈল ও কিঞ্চিৎ নৈবেদ্যের সংস্থান মাত্র। তথায় সন্ধ্যার পরে গ্রামবাসিগণ সমবেত হইয়া এক মনে ও ভক্তিভরে পুণ্যময় সুমধুর ভাগবতী কথা শ্রবণ করে, পরে অবহিত ভাবে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। লোক চর্চ্চা ও পরকুৎসাও যে তথায় একেবারে স্থান পায় না এমন নহে। ভাগবত গৃহে অপরিচিত বিদেশীগণ আহার ও বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাও বঙ্গদেশীয়গণের পক্ষে অনুকরণীয়।

ইংরাজাধিকারের বহু পূর্ব্ব হইতে উৎকলে বহু বাঙ্গালীর বাস চলিয়া আসিতেছে। মুসলমানদিগের কর্ম্মচারীরূপে উক্ত বঙ্গবাসীগণ তথায় গমন করিয়াছিলেন পরে তথায় আহার্য্য সামগ্রীর সুলভতা দর্শনে এবং জমীজিরাতের সংস্থান পথ অপেক্ষাকৃত সুগম বিবেচনায় তাঁহারা তথায় বসতি স্থাপনের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। রেলওয়ে হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের পুত্র কন্যাগণের বিবাহ কার্য্য তদ্দেশ প্রবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যেই সম্পন্ন হইত, কিন্তু বর্ত্তমানকালে সে নিয়মের আর তাদৃশ প্রচলন পরিলক্ষিত হয় না। উহাদের আচার ব্যবহারের ও ভাষা সম্বন্ধেও এক্ষণে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। 'সাগরপেসা' ও 'হাটুয়া ভাণ্ডারী' জাতি ভিন্ন অন্য কোনও জাতি প্রকাশ্যে বাঙ্গালীর উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে না।

উড়িষ্যা দেশে পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত ছিল কিন্তু কতকগুলি মিসনরি সাহেবের যত্নে উড়িষ্যা স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাঁহা-

দের চেষ্টায় প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্ত্তে উড়িষ্যায় উড়িয়া ভাষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাঁয় বাঙ্গালা ও উড়িয়া ভাষার মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য বর্ত্তমান; অক্ষরগুলি অনেকাংশে বাঙ্গালা অক্ষরেরই রূপান্তর মাত্র। বালেশ্বর জেলা স্কুলের পণ্ডিত কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে' শীর্ষক গ্রন্থে উভয় ভাষার মধ্যে একতার সামঞ্জস্য স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। দেশ-মান্য বহু ভাষাবিৎ মনীষি পণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়ও উক্ত মতের অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। "Star of Utkul" নামক পত্রিকার সুদক্ষ সম্পাদক যথার্থই লিখিয়াছিলেন যে দুটী ভাইয়ের একটী ভাই সুবর্ণরেখার এক পারে ও অপরটী অন্য পারে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাষার প্রকৃতি বিপর্য্যয়ে তাঁহাদের একজন উড়িয়া ও অন্য জন বাঙ্গালী হইয়াছেন।

বিচ্ছন্দ পাটনায়ক তাঁহার উড়িয়া ভুগোলে লিখিয়াছেন "উড়িয়ামানে যে প্রকার উচ্চারণ করন্তি তহিঁরু হঠাৎ বোধ হুয়ে সে মানঙ্কর ভাষা বাঙ্গালারু সম্পূর্ণ পৃথক। মাত্র বাস্তবিক তাহা নুহে, সেমানে হলন্ত শব্দ ব্যবহার করন্তি নাহিঁ। যেউশব্দ বঙ্গভাষারে হলন্ত ব্যবহার হুয়ে সেমানে তাকু স্বরান্ত করি উচ্চারণ করন্তি এবং সকল কথা অতি শীঘ্র শীঘ্র কহন্তি; এই কারণরু বুঝা যাই ন পারে। কিঞ্চিৎ কাল উড়িয়া মানঙ্ক সঙ্গে কাথাবার্ত্তা কলে বোধ হুয়ে যদি বা উড়িয়া বাঙ্গালা এই দুই ভাষা ঠিক এক নুহে, তথাপি সে দুই ভাষার অনেক ঐক্য আছি।

বাবু ফকির মোহন সেনাপতি লিখিয়াছেন—"একথা যথার্থ অটে যে, কেবল ক্রিয়ামাত্র পরিবর্ত্তন করি দেলে বাঙ্গালা উড়িয়া হোই যাএ।"

উড়িয়া ভাষায় বাঙ্গালা ভাষা অপেক্ষা বহু পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। উড়িয়া শব্দ মাত্রই হলন্ত হীন; শব্দের শেষস্থ 'ল' 'ড়' র মত ও 'ঋ' 'রু' র মত উচ্চারিত হয়। 'ঋষি' শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে 'রুষি' বলা হয়। বাঙ্গালা ভাষায় মধ্যে এখনও অনেক উড়িয়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে—'গোটা' কতক যেওর 'পো' ছেলে 'পিল্লে' ইত্যাদি অনেক উড়িয়া-বাসীর মতে উড়িয়া ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা এবং উহা অত্যন্ত প্রাচীন; তাঁহারা বলেন পুরাকালে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইবার অনেক

পূর্ব্বে উড়িয়া ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। কথিত ও লিখিত উড়িয়া ভাষায় কোনও প্রভেদ নাই। চাটশালী (পাঠশালা) হইতেই ছেলেরা সুর করিয়া পড়িতে শিখে। পূর্ব্বে আমাদের দেশের অল্পশিক্ষিত দোকানদারগণ যেরূপ সুর করিয়া রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিত, উড়িয়া ভাষায় লিখিত প্রত্যেক পুস্তক এখনও ঠিক সেই রূপেই পঠিত হইয়া থাকে। একটু মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিলেই উড়িয়া কথাবার্ত্তা সহজে বুঝিতে পারাযায়। জগন্নাথদাসের ভাগবত, বলরাম দাসের রামায়ণ, সরলা দাসের ভারত ও অচ্যুতানন্দের হরিবংশ সকল উৎকল বাসীই বিশেষ ভক্তির সহিত পাঠ করে। জগন্নাথদাস চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। উপেন্দ্রভঞ্জ উৎকলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। উড়িষ্যা-বাসী বাঙ্গালী উৎকল দীপিকার সম্পাদক বাবু গৌরীশঙ্কর রায় অনেক উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত করিয়া উড়িয়াভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। উড়িষ্যা-বাসীগণ তাল পত্রের উপর লৌহ লেখনী সহযোগে লিখন কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। উহারা মাতাকে "বৌ," পিতামহকে "যে যে বাপ" দাদাকে 'নানা' মাতামহীকে "আঈ" এবং জামাতাকে 'জুই' বা "জোঁয়াই" বলিয়া সম্বোধন করে।

উড়িষ্যার ধান্যাদির পরিমাণ প্রণালী এইরূপ, যথা ৪ সেরে এক গৌনি ২০ গৌনিতে এক মণ ও ৮ মণে এক 'ভরণ' হয়। তথায় বিঘার প্রচলন নাই; বাঙ্গালা দেশের প্রায় তিন বিঘাতে উড়িষ্যার এক মান বা একার (৪৩৫৬০ বর্গ ফুট) হয়, ও ২০ মানে এক 'বাটী' হয়। বালেশ্বর জেলায় ৮০ তোলায় সের প্রচলিত, কিন্তু পুরী ও কটক জেলায় ১০৫ তোলায় সের ব্যবহৃত হয়; ইহা আমাদের দেশের প্রায় ১॥৵০ র সমান। ধান্য, চাউল, মুগ, খেঁসারি, কুলৃতি কলাই প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। উড়িষ্যার সাধারণতঃ অধিকাংশ লোকই নিতান্ত নিঃস্ব। মজুরের হার বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা সমধিক সুলভ; দৈনিক মজুরের হার সাধারণতঃ সাত পয়সা।

স্নানযাত্রা ও দোলযাত্রা উপলক্ষে বহু পরিমাণ ধর্ম্ম প্রাণ হিন্দুই পুরুষো-ত্তম ধামে গমন করিয়া থাকে। ভাদ্র মাসে ও কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন 'উদা' (উপবাস) হয় এবং তাহার পরবর্ত্তী দিন হইতে পিঠাপার্ব্বণ হয়। কার্ত্তিক

পূর্ণিমার 'উদার' নাম 'বড়' উদা। সহর ভিন্ন অপর স্থলে অশ্বযানের প্রচলন নাই; যাতায়াত প্রভৃতি কার্য্য সাধারণতঃ গো শকটেই হইয়া থাকে। জঙ্গলে বন্য কুক্কুট, হরিণ, চিতাবাঘ ও নানাবিধ পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যার প্রায় সর্ব্বত্রই সাল কাষ্ঠের জঙ্গল আছে। পূর্ব্বে চিল্কাহ্রদে লবণ প্রস্তুত হইত, ১৯০০ সাল হইতে আর তাহা হয় না।

পূর্ব্বে উড়িষ্যায় প্রায়ই দুই এক বৎসর অন্তর দুর্ভিক্ষ হইত; ১৮৬৭ সালের ভীষণ ও মর্ম্মস্পৃক দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যার বহু অধিবাসী কালগ্রাসে পতিত হয়। তদানীন্তন সময়ে জল অভাবেই প্রচুর শস্য-হানি ঘটিত এবং তাহার ফলেই মধ্যে মধ্যে দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। তৎপ্রতীকার কল্পে প্রজাবৎসল সদাশয় গবর্ণমেণ্ট, মহানদী, বিরূপা, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি সুদুস্তর নদীতে Anient বা বাঁধ বাঁধিয়া তাহাদের জল প্রবাহ রোধ পূর্ব্বক তত্তৎ নদীর জল ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ আকারের প্রবাহিকা পথে ("Canal") দেশের সর্ব্বত্রই জল সরবরাহ করিতেছেন, তাহার ফলে ইদানীন্তন কালে দুর্ভিক্ষের সে করাল ছায়া আর প্রায়ই দেশে পতিত হইতে পায় না। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নদীগুলিতে প্রায়ই জলাভাব। বর্ষা সঞ্চারে নদীতে বিষম প্লাবন উপস্থিত হওয়ায় সময়ে সময়ে ভীষণ অনর্থপাত ও ঘটিয়া থাকে।

প্রত্যেক গ্রামেই সাধারণের ব্যবহারোপযোগী কিছু কিছু জমি আছে। পুরীর রাজার রাজ্যপ্রাপ্তির সময় হইতেই উড়িষ্যায় বৎসর গণনা আরম্ভ হইয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পুরীর পথ।

হাবড়া হইতে রেল যোগে পুরী যাইতে হইলে যে যে প্রধান নগর, তীর্থ-স্থান ও নদী অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, তাহাদের বিবরণ:

কোলাঘাট।

এখানে রূপনারায়ণ নদীর উপর বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের একটী প্রকাণ্ড সেতু আছে। এখান হইতে ঘাটাল ও তমলুক (তাম্রলিপ্তি) যাওয়া যায়।

তমলুকে কৃষ্ণার্জ্জুন ও বর্গভীমার, দুইটী অতি প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান থাকিয়া পুরাকালের আর্য্য কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

খড়্গপুর।

এখানে বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানীর একটী বিশাল ষ্টেসন্ ও প্রকাণ্ড কারখানা আছে। এখান হইতে একটী রেল লাইন মেদিনীপুর ভেদ করিয়া উত্তরদিকে ঝরিয়া ও বরাকর কয়লার খনিরদিকে, অন্যটী পশ্চিম অভিমুখে নাগপুরেরদিকে এবং আর একটী দক্ষিণদিকে কটক, পুরী ও মান্দ্রাজ অভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে। মেদিনীপুরে বিরাট রাজার দক্ষিণ গোগৃহের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান থাকিয়া পৌরাণিক যুগের জলন্ত পরিচয় প্রদান করিতেছে।

দাঁতন।

এখানে শ্যামলেশ্বরের মন্দির এবং বিদ্যাধর ও শশাঙ্ক নামে দুইটী দীর্ঘিকা আছে। বৈষ্ণবগণ বলেন চৈতন্যদেব এখানে দাঁতন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম দাঁতন হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে বুদ্ধদেবের * দন্ত কলিঙ্গ (ভুবনেশ্বর) হইতে এই স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম দন্তপুর বা দাঁতন হইয়াছে।

সুবর্ণরেখা নদী।

ইহা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার মধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত। পূর্ব্বে এই নদীর বালুকা রাশির সহিত সুবর্ণকণা পাওয়া যাইত বলিয়া উহা উক্ত নামে অভিহিত।

রূপ্‌সা ও ময়ূরভঞ্জ।

রূপ্‌সা ষ্টেসন্ হইতে ৩৩ মাইল বিস্তৃত ছোট রেল লাইনে ময়ূরভঞ্জ নামক করদ রাজ্যের রাজধানী বারিপদায় গমন করা যায়। বারিপদা বুড়াবলং নদীর

---

* বুদ্ধদেবের শিষ্য ক্ষেম্ বুদ্ধের বাম পার্শ্বের একটী দন্ত গ্রহণ করিয়া কলিঙ্গাধিপতি ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত সেই দন্ত স্বীয় রাজধানীতে সংস্থাপন করেন। দন্ত সংস্থাপনের জন্য উক্ত স্থান দন্তপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন প্রাচীন দন্তপুর পুরী। কনিংহাম সাহেবের মতে বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী প্রাচীন দন্তপুর।

তীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ জয়পুর রাজবংশীয় জয়সিংহ জগন্নাথ দর্শন উপলক্ষে উড়িষ্যায় আগমন করিয়া তদানীন্তন রাজা ময়ূরধ্বজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার বিক্রম ভঞ্জন করিয়াছিলেন, তদনুসারে এই রাজ্যের নাম ময়ূরভঞ্জ হইয়াছে। এই রাজ্যের আয় প্রায় ৯॥ লক্ষ টাকা। এবং গবর্ণমেণ্টকে ১০৬৮৲ মাত্র কর দিতে হয়। মহারাজার পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড দিবার ক্ষমতা আছে। তাঁহার অধীনে একজন দেওয়ান, একজন ষ্টেট জজ ও দুই জন মুন্সফ আছেন। পরলোকগত মহারাজ বাহাদুর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। তিনি রাজ্যের অনেক প্রকার উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

বালেশ্বর।

ইহা বুড়াবলং নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখান হইতে কলিকাতা ৭২ ক্রোশ এবং ইহার তিন ক্রোশ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। কটকরোড বালেশ্বরের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। চাঁদবালী নামক বন্দর এখান হইতে ১৪ ক্রোশ। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ক্ষেত্রমোহন দে কোম্পানি বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে নীলগিরি নামক ক্ষুদ্র করদ রাজ্য পর্য্যন্ত একটী ছোট রেলওয়ে লাইন নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ষ্টেশনের নিকট ঝাড়েশ্বর স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের মন্দির আছে, এখানে প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময় মেলা হয়।

রেমুনা।

ইহা বালেশ্বর হইতে তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত এবং এখানে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দির আছে। বালেশ্বরের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর গোপীনাথের মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। উৎকলে অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরেও উদ্দেশ্যানভিজ্ঞ সাধারণ জনগণের পক্ষে কুরুচিব্যঞ্জক মূর্ত্তি আছে। গোপীনাথের "ক্ষীরচোরা" নাম হওয়া সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে :—

মাধবেন্দ্রপুরী গোবর্দ্ধনে গোপাল দেবকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার স্বপ্নাদেশক্রমে সুগন্ধ চন্দন আনয়নার্থ দক্ষিণ দেশে যাইবার পথে রেমুনায় গোপীনাথ দর্শন করেন। তথায় তাঁহার অমৃতকেলি নামক ক্ষীরভোগের আয়োজন ব্যাপার

দর্শন করিয়া তাঁহার মনে তদীয় ইষ্টদেব গোপালকেও সেই ভোগ দিবার বাসনার সঞ্চার হয়।

অন্তর্যামী গোপীনাথ ভক্ত মাধবেন্দ্রের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার ভোগ হইতে কিয়ৎপরিমাণে ক্ষীর আত্মসাৎ করিয়া স্থানান্তরে গোপন করিয়া রাখেন; অনন্তর সেই ক্ষীরের পাত্র মাধবেন্দ্র দ্বারা তাঁহার ইষ্টদেবের ভোগ দিবার জন্য পূজারিকে স্বপ্নে আদেশ করেন। মাধবেন্দ্র পূজারির নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই রাত্রেই অমৃতকেলি ভোগ লইয়া গোপালকে ভোগ দিবার জন্য প্রস্থান করেন। এই জন্য গোপীনাথের "ক্ষীরচোরা" নাম হইয়াছে। চৈতন্য-দেব এখানে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে ১৩ দিন ধরিয়া গোপীনাথের মেলা হইয়া থাকে।

ভদ্রক।

ইহা বালেশ্বর জেলার একটী মহকুমা এবং শালিন্দী নদীতীরে অবস্থিত। যেখানে রেল ষ্টেশন আছে সেই স্থানটীর নাম চরম্পা। এখান হইতে চাঁদবালী নামক বন্দরে যাইবার একটী রাস্তা আছে। গো, মেষ, ছাগল প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশু বিক্রয়ের জন্য প্রতি বুধবারে এখানে একটী হাট হইয়া থাকে। ভদ্রকের জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। ভদ্রকালী দেবীর নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে।

বৈতরণী নদী—যাজপুর।

(বিরজা ক্ষেত্র)

যাজপুর বৈতরণী রোড নামক ষ্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে বৈতরণী নদীতীরে অবস্থিত। বঙ্কিম বাবুর "সীতারামে" বৈতরণী নদীর সুন্দর বর্ণনা আছে। গোশকট-যোগে তথায় যাইতে হয়, ভাড়া আন্দাজ ১।০ দেড় টাকা। কিন্তু এক্ষণে বৈতরণী রোড নামক পথটী জলপ্লাবনে স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া যাওয়ায়, পরবর্ত্তী ষ্টেশন ব্যাস সরোবর নামক স্থান হইতে যাওয়াই সুবিধা জনক। ব্যাস সরোবর হইতে যাজপুর পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ মাইল বিস্তৃত সুগম পাকা রাস্তা আছে। যাজপুর যজ্ঞপুরের অপভ্রংশ। উহা মহারাজ যযাতি কেশরী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মতান্তরে যাজপুর যযাতিপুরের অপভ্রংশ। পুণ্যতোয়া

বৈতরণী স্নান সর্ব্বপাপ নাশক। উক্ত নদী তীরে শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। মহাভারতের "বনপর্ব্বে" পাণ্ডবদের কলিঙ্গ দেশে আগমন উপলক্ষে লিখিত আছে "এই স্থানে স্রোতস্বতী বৈতরণী প্রবাহিত হইতেছে, এই স্থানে ধর্ম্ম দেবগণের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।" যযাতি কেশরী অযোধ্যা হইতে দশ সহস্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদিগকে বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করিয়া তাঁহাদিগকে এই স্থানে বাস করাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে বেদ অপহৃত হইলে ব্রহ্মা এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া বিষ্ণুকে তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণু বরাহরূপে যজ্ঞকুণ্ড হইতে বেদ উদ্ধার করিয়া দেন, সেই জন্য এই স্থানের নাম যজ্ঞপুর হইয়াছিল। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে পৃথিবী পর্ব্বত সমূহের দুর্ব্বহ ভারে জলমগ্ন হইয়া রসাতলগত হইলে দেবগণ স্তব দ্বারা বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করেন, অনন্তর বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক রসাতলগত ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করেন। রাজা প্রতাপরুদ্রদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মন্দিরে বরাহদেবের মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের সামুমাই নামক চত্বরে গোদান এবং গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া বৈতরণী পার হইতে হয়। ভক্তিভরে বৈতরণী উত্তীর্ণ হইলে অকূল ভবনদী পারের পথ সুগম হইয়া আইসে। নদীর তীরে মণিকর্ণিকা ও দশাশ্বমেধ নামক ঘাট বিদ্যমান। তাহার অপর পারে অষ্ট মাতৃকার মন্দিরে বারাহী, চামুণ্ডা, ঐন্দ্রী বৈষ্ণবী, নারসিংহী, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী ও কৌমারী, বর্ত্তমান যমরাজ তাঁহার মা, খুড়ি, জেঠাই, মাসি, পিসী, স্ত্রী ও শ্মশান ভৈরবী এই নামে বিরাজিত আছেন। অদূরেই জগন্নাথদেবের মন্দির বিরাজিত। ইহার দেড় ক্রোশ দূরে বিরজাদেবীর মন্দির ও বিরজা-কুণ্ড অবস্থিত। যাজপুরকে বিরজা ক্ষেত্র নামে অভিহিত করা হয়।

"উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজা ক্ষেত্র মুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ॥"

সতীর নাভিদেশ এখানে পতিত হওয়ায় ব্রহ্মা তথায় যে মূর্ত্তি স্থাপন করেন তাহাই বিরজা নামে প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের উত্তরভাগে নাভিগয়া নামক কূপ আছে। এখানে পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডদান করিতে হয়। সতীর নাভিদেশ পতিত হওয়ায় উহা নাভিগয়া নামে খ্যাত, প্রকারান্তরে কিন্তু কথিত আছে যে

গয়াসুরের মস্তক গয়াধামে পতিত হইয়াছিল বলিয়া তাহা গয়াশীর্ষ, নাভি যাজপুরে পতিত হইয়াছিল বলিয়া তাহা নাভিগয়া এবং পাদ গোদাবরীতীরে পীঠাপুরে পতিত হইয়াছিল বলিয়া তাহা পাদগয়া নামে খ্যাত হইয়াছে। কিন্তু পাণ্ডাগণ বঙ্গদেশবাসী যাত্রীগণকে বলিয়া থাকেন চট্টগ্রামের নিকট পাদগয়া অবস্থিত। নাভিকুণ্ডে পিণ্ডদান করিলে পিতৃপুরুষগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

১৫৫৮ খৃঃ অব্দে গৌড়ীয় বাদসাহ সোলেমান ফরাসীর হিন্দুকুলকলঙ্ক পাষণ্ড সেনাপতি কালাপাহাড় যাজপুর বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। যাজপুরের দুই ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে "গহ্বর টিকরি" নামক স্থানে কালাপাহাড় যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যাজপুরের নিকট "শুভস্তম্ভ" নামক ৩৭ ফিট উচ্চ কেশরী বংশের জয়স্তম্ভ আছে। এক সময়ে যাজপুর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। সব্ ডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট কাছারির চত্বরে অনেকগুলি সুবৃহৎ প্রাচীন প্রস্তর মূর্ত্তি রক্ষিত আছে।

ব্যাস সরোবর।

কথিত আছে ব্যাসদেব এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে দুর্য্যোধন জলস্তম্ভ বিদ্যা প্রভাবে এই হ্রদে লুকাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণী নদী।

লোহারডাগার পাহাড় হইতে উৎপন্না বিষ্ণুপাদোদ্ভবা নয়টি নদীর অন্যতমা ঃ—

"আদ্যা গোদাবরী গঙ্গা দ্বীতিয়া চ পুনঃপুনা।
তৃতীয়া কথিতা রেবা চতুর্থী জাহ্নবী স্মৃতা।
কাবেরী গৌতমী কৃষ্ণা ব্রাহ্মণী বৈতরণী তথা
বিষ্ণু পাদাব্জ সম্ভূতা নবধা ভুবি সংহিতা"

ধানমণ্ডল।

(মহা বিনায়ক ক্ষেত্র)

ধানমণ্ডল ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের উপর মহা বিনায়ক গণেশদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। শত শত বৎসর পূর্ব্বে অনিরুদ্ধ

গঙ্গাবংশীয় ভীষ্মদেব কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহাই মহা বিনায়ক ক্ষেত্র। প্রতিমূর্ত্তির পাঁচটী মুখ, প্রথমটী গণেশের, দ্বিতীয়টী শিবের, তৃতীয়টী গৌরীর, চতুর্থ টী সূর্য্যদেবের এবং পঞ্চমটী বিষ্ণুর। গনেশাদি পঞ্চদেবতার মূর্ত্তি হইলেও সাধারণ লোকে এই স্থানকে"মহাবিণা"বলিয়া থাকে। এখানে একটী প্রস্রবণ আছে। ইহার চারিক্রোশ দক্ষিণে নলতিগিরি (ললিতগিরি) পাহাড়ে অনেকগুলি গুহা এবং দুইটি চন্দন বৃক্ষ আছে। "এক কালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকাস্তূপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দন বৃক্ষ, আর মৃত্তিকা প্রোথিত ভগ্ন গৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তর গঠিত মূর্ত্তিরাশি।" নলতি গিরির উপরে যে ধ্বংসস্তূপ বিদ্যমান তাহা রাজা বাসুকল্প কেশরীর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে যে দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে তাহার নাম পূর্ব্বে অমরাবতী ছিল। একটি ক্ষুদ্র মঞ্চের উপর ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মূর্ত্তি আছে। একপারে ললিতগিরি, অপর পারে উদয়গিরি (আলতি পরগণায় অবস্থিত বলিয়া ইহা আলতিগিরি নামে খ্যাত) মধ্যে বিরূপা নদী; উদয়গিরিতে বুদ্ধদেবের একটী মন্দির আছে। নলতিগিরির উপরস্থিত ভগ্নাবশেষের মধ্যে গুরু বাসুলি ঠাকুরাণীর মন্দির আছে। এই উদয়গিরি ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী সুবিখ্যাত উদয়গিরি নহে। ধানমণ্ডল হইতে ১৩ মাইল দূরে আলামগীর পাহাড় নামে একটা পাহাড় আছে। ইহার পূর্ব্বনাম চতুষ্পীঠ ছিল। পাহাড়ের উপর একটা গৃহ আছে এবং পীরের পদ চিহ্ন আছে।

মহানদী।

ইহা মধ্য ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া উড়িষ্যার মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। মূনা, চিত্রতোলা, বিরূপা, কাঠজুড়ি প্রভৃতি ইহার অনেক শাখা প্রশাখা আছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৫২৯ মাইল। কটক হইতে ৭ সাত মাইল দূরে ইহা হইতে কাঠজুড়ি নামক একটি শাখা বহির্গত হইয়া আবার এই নদীতে মিলিত হইয়াছে। কটক সহর মহানদী ও কাঠজুড়ির মধ্যে অবস্থিত। মহানদীর প্রকাণ্ড anicut (বাঁধ) ও রেলওয়ে সেতু সকলেরই দ্রষ্টব্য—এমনই উহার বিস্ময়াবহ নির্ম্মাণ নৈপুণ্য ও অপরূপ কারুচাতুর্য্য!

কটক।

এইস্থানে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা কমিশনার সাহেব বাস করেন। এখানে একটী কলেজ, ৪টী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, সর্ভেস্কুল, মেডিকেল স্কুল, নর্ম্মাল স্কুল প্রভৃতি বহু বিদ্যালয়, বিদ্যমান আছে। মহিষ ও মৃগ শৃঙ্গ-নির্ম্মিত বিবিধ কারুকার্য্য খচিত মনোহর দ্রব্য এবং স্বর্ণ ও রজত নির্ম্মিত নানাবিধ অলঙ্কার এখানে পাওয়া যায়। মহানদীর মধ্যস্থিত একটা দ্বীপে ধবলেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিরাজিত। কটক কেশরীবংশীয় রাজা নৃপকেশরী কর্ত্তৃক স্থাপিত এবং অদ্যাবধি ইহা উড়িষ্যার রাজধানী। কথিত আছে পৌরাণিকযুগে সর্পযজ্ঞ-কালে রাজা জন্মেজয় কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কটক সহরটীকে বর্ষাকালে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্য মহা-রাষ্ট্রীয়গণ কাঠজুড়ি নদীর তীরে যে প্রস্তর নির্ম্মিত একক্রোশ দীর্ঘ বাঁধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা আজও বর্ত্তমান আছে। বাঁধটী দেখিলে হিন্দুজাতির স্থপতি-বিদ্যার চরম নৈপুণ্যের একটী পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন কেশরী বংশীয় নরপতি মকর কেশরী ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। গড়জাত মহলের কতিপয় রাজার উপর জগন্নাথদেবের রথের কাষ্ঠ সরবরাহের ভার অর্পিত আছে, বর্ষাকালে 'মাড়' বাঁধিয়া সেই সকল কাষ্ঠ শঙ্খ ও ঘণ্টা ধ্বনির সহিত এই নদী দিয়া লইয়া যাওয়া হয় বলিয়া ইহার নাম কাঠজুড়ি হইয়াছে। কাঠ গুলিকে ভাসাইয়া এই নদীর সহিত সংলগ্ন কোয়াখাই ও ভার্গবী নদী দিয়া দামোদরপুরে এবং তথা হইতে গো যান সহযোগে পুরী লইয়া যাওয়া হয়।

ভুবনেশ্বর।

(শাম্ভব ক্ষেত্র বা একাম্র কানন।)

ভুবনেশ্বরের অপর নাম শাম্ভব ক্ষেত্র বা একাম্র কানন। কানন মধ্যে একটি আম্র বৃক্ষ ছিল বলিয়া একাম্র কানন হইয়াছে। ভুবনেশ্বর লিঙ্গের পূর্ণনাম ত্রিভুবনেশ্বর; পাণ্ডাগণ লিঙ্গরাজ এবং কৃত্তিবাস বলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্র-লাল মিত্রের মতে ভুবনেশ্বরই "কলিঙ্গ নগরী" এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণ হইলে দেহাবশেষের একখণ্ড "দন্ত" এই স্থানেই রক্ষাকরা হয়, পরে উহা দাঁতনে

স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। রাজা গুহশিবের কন্যা হেমমালা ও জামাতা দন্তকুমার এই দন্ত সিংহলে স্থানান্তরিত করেন। ইহা এক্ষণে সিংহলদ্বীপের কাণ্ডি নগরে “নলদা মালাপাওয়া” মন্দিরে রক্ষিত আছে। মন্দিরের চাবি প্রধান বৌদ্ধ নায়কের হস্তে থাকে এবং তিনি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি, সিংহলী রাজবংশের প্রতিনিধি, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রতিনিধি প্রভৃতি সকলের মত গ্রহণ করিয়া মন্দিরের দ্বার উদ্ঘটিত করিতে পারেন। দন্তটী নানা ধাতুরঞ্জিত একটী সুবর্ণ পদ্মের অভ্যন্তরে রাখা হয়। তামিল হিন্দুগণ এই দন্তকে হনূমানের দন্ত বলিয়া পূজা করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে হনূমান সীতা অন্বেষণে লঙ্কায় গমনের চিহ্ন স্বরূপ একটী দন্ত সেথায় রাখিয়া আসেন। Plinyর মতে কলিঙ্গদেশ গঙ্গাসাগর সঙ্গম হইতে গোদাবরী তীরে “কোরিঙ্গা” পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রেল লাইনটী ভুবনেশ্বর মান্দরের নিকট দিয়া গিয়াছে কিন্তু ষ্টেসনটী প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ষ্টেসনে গোযানের অভাব নাই। ভাড়া তিন আনা। মহারাজা যযাতি কেশরী ভুবনেশ্বরের স্থূলকায় অভ্রংলিহ মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন, পরে মহারাজা ললাটেন্দু কেশরী উহার নির্ম্মান কার্য্য সমাধা করিয়া তন্মধ্যে লিঙ্গরাজ দেবের প্রাতষ্ঠা করেন।

কথিত আছে এখানে এককালে শত সহস্র মন্দির বিদ্যমান ছিল কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে চারি হইতে পঞ্চশতাধিক সংখ্যার অতিরিক্ত মন্দিরের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। চতুর্দ্দিকস্থ ধ্বংসাবশেষ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে উহা এক সময় একটী অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। এখানকার জল বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। ভুবনেশ্বরের চতুর্দ্দিক কুচিলার গাছে পূর্ণ। মন্দিরের কার্য্য পরিচালনার জন্য এবং লিঙ্গরাজের পূজা ও সেবার নিমিত্ত বাৎসরিক দুই সহস্র মুদ্রার আয়ের সম্পত্তি ন্যস্ত করা আছে। এতদ্ভিন্ন তীর্থ যাত্রীগণ প্রণামী স্বরূপ যাহা মন্দিরে প্রদান করেন তাহাও মন্দির তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হয়। মন্দিরটি ১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ১০ আইন অনুসারে একটী কমিটির তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে; মন্দির সংস্কারের জন্য প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে দুই পয়সা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এখানে পুরী লজিং হাউস আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মন্দিরের নিকটে একটি চিকিৎসালয় আছে। উৎকল খণ্ডে লিখিত



ভুবনেশ্বর

আছে সতী দেবীর মাতা তাঁহাকে একদিন পরিহাস করিরা বলিয়াছিলেন "এত তপস্যা করিয়া একটী বৃদ্ধ বর পাইলে এবং চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করিতে হইল!" সতী সে কথায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধা হইয়া মহাদেবকে স্থানান্তরে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করায়, তিনি তদনুসারে বারানসাধাম নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। দ্বাপর যুগে কাশীরাজ নৃপতি মহাদেবকে স্তব দ্বারায় সন্তুষ্ট করিয়া "নারায়ণকে প্রহার করিতে পারি" এই বর প্রাপ্ত হন এবং নারায়ণকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। নারায়ণ স্বীয় চক্রদ্বারা কাশী-রাজের মস্তক ও পুরী দগ্ধ করিলেন। নারায়ণের ভয়ে ভীত হইয়া মহাদেব তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যদি বারা-নসীধামকে স্থিরতর রাখিতে চাও, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া তাহার উত্তরাংশে একাম্র নামক প্রসিদ্ধ কাননে পার্ব্বতী সহ নির্ভয়ে বাস কর। মহাদেব নারায়ণের এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া একাম্র কাননে বাস করিয়া ছিলেন। ভুবনেশ্বরের নিকট গন্ধবতী নামে একটী ক্ষুদ্র নদী আছে তাহাতে সকল সময়ে জল থাকে না। একাম্র পুরাণে লিখিত আছে,ভগবান রুদ্র ভূতগনের মঙ্গল বিধানের জন্য প্রচ্ছন্ন রূপিনী গন্ধ-বতী নাম্না গঙ্গাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। কপিল সংহিতার মতে গন্ধবতীই আদি গঙ্গা।

দেবী পাদহরা।

এই হ্রদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে একদা পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কৈলাস পর্ব্বতের মত আপনার তপস্যার উপযুক্ত মনোরম স্থান আর কোথায় আছে?" মহাদেব উত্তর করিলেন সুবর্ণকোট পর্ব্বতে তদ্রূপ মনোরম একটী স্থান আছে এবং তিনি তথায় গমন করিয়া স্বীয় ইষ্টদেবকে সমাহিত মনে পূজা করিয়া থাকেন। পার্ব্বতী স্বামীমুখে একাম্র কাননের বিবরণ অবগত হইয়া তথায় যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, এবং স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় গমন করিয়া স্বামীর নির্দ্দেশিত তপস্যা স্থানটী দেখিতে পাইলেন না; উপায়ন্তর না দেখিয়া স্বামীর পূজার প্রধান উপকরণ দুগ্ধ দ্বারা তাঁহার পূজা করিবার মানসে কতকগুলি ধেনু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে পালন

করিতে লাগিলেন। একদা একটী গাভী একখণ্ড শিলার উপর স্ব-ইচ্ছায় দুগ্ধ দান করিতেছে দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার আরাধ্য দেবতা ঐ স্থানেই তপস্যায় নিরত আছেন, অনন্তর তিনি সেই স্থানে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। * মহাদেব পার্ব্বতীর স্তবে প্রীত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। পার্ব্বতী ঐ স্থানে থাকিয়া যাহাতে স্বামীর সেবা ও পূজা করিতে পান এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। একদিন পার্ব্বতী গোপালিনী বেশে তথায় গোচারণ করিতেছেন, এমন সময়ে কৃত্তি ও বাস নামক দুইটী অসুর কামোন্মত্ত হইয়া তাঁহার সকাশে তাহাদের অসৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। পার্ব্বতী মহাদেবকে স্মরণ করিয়া অসুরদ্বয়কে বধ করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি ইতঃপূর্ব্বে এই অসুর-দ্বয়ের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া "কোনও পুরুষ কর্ত্তৃক বা কোনও অস্ত্র দ্বারা বধ্য হইবে না" এইরূপ বর দিয়াছিলেন বলিয়া মহেশ্বর পার্ব্বতীকেই পদদলিত করিয়া উহাদিগকে বধ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। ভুবনেশ্বর মন্দিরের অদূরে যে স্থানে পার্ব্বতী কৃত্তিওবাস নামক দৈত্যদ্বয়কে পদদলিত করিয়া বধ করিয়াছিলেন সেই স্থানটী দেবী-পাদ-হরা নামক হ্রদে পরিণত হইয়াছে। ইহার চতুস্পার্শে ১০৮টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। কথিত আছে কৃত্তি ও বাস অসুরদ্বয় পুনরায় পাতাল হইতে উঠিতে পারে এই ভয়ে পার্ব্বতী ১০৮ যোগিনীকে এই সকল মন্দিরে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। ভ্রান্তি ক্রমে দেবী পাদ হরাকে সহস্র লিঙ্গ বলা হয় কিন্তু তাহা নহে। এই হ্রদের জল স্পর্শ করিতে হয়।

বিন্দু সরোবর।

প্রাগুক্ত অসুরদ্বয়কে পরাজিত করিয়া পার্ব্বতী অত্যন্ত ক্লান্ত ও পিপাসায় কাতর হইলে, মহাদেব ত্রিশূল দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গার জল এবং সমস্ত তীর্থের জল বিন্দু বিন্দু আনিয়া তাঁহার পিপাসা দূর করেন। এই হ্রদটী বিন্দু সরোবর নামে অভিহিত। পার্ব্বতীর প্রার্থনায় ও মহাদেবের বর প্রভাবে এই সরোবরে সকল তীর্থের জল বিন্দু বিন্দু পরিমাণে

* তারকেশ্বর দেব সম্বন্ধেও এইরূপ শুনা যায়।

সঞ্চিত চিরদিন থাকিবে এবং ইহাতে স্নান ও তর্পন করিলে মনুষ্যগণ শিবলোক প্রাপ্ত হইবে। কথিত আছে পূর্ব্বে এই হ্রদের একদিক দিয়া প্রস্রবন নিঃসৃত জল রাশি আসিয়া তাহা অন্যদিক দিয়া বহির্গত হইয়া যাইত। বর্ত্তমানে আর সেরূপ ভাব নাই। বিন্দু সরোবরের ন্যায় সুবৃহৎ হ্রদ অপর কোনও তীর্থস্থানে আর নাই। ইহার পূর্ব্বদিককে "মনি কর্ণিকা" দক্ষিণ দিককে "ত্রিশূল" পশ্চিম দিককে "বিশ্রাম" ও উত্তর দিককে "গোদাবরী" বলে। ইহার ঠিক মধ্য স্থানে একটী মন্দির আছে তাহাকে জগতী মন্দির কহে। এখানে একটী চন্দন কুণ্ড আছে ; বৈশাখ মাসে ভুবনেশ্বর, অনন্ত বাসুদেব ও কপিলেশ্বর দেবের প্রতিনিধি গণকে নৌকা যোগে এখানে আনিয়া ২২ দিন রাখা হয়। ইহাকে ভুবনেশ্বরের চন্দন যাত্রা বলে। লিঙ্গরাজের প্রতিনিধির নাম চন্দ্রশেখর।

অনন্ত বাসুদেব।

বিন্দু সাগরের পূর্ব্বদিগের ঘাটের উপর অনন্ত বাসুদেবের (কৃষ্ণ ও বলরামের) মন্দির। এই মন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর এবং ইহাই এখানকার সর্ব্ব প্রাচীন মন্দির।

কোটী তীর্থ।

দশ বৎসর পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে ইহাতে ঝরণার জল একদিক হইতে আসিয়া তাহা অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইত ; কিন্তু এক্ষণে ইহা শুষ্ক। পাণ্ডাগণ বলেন বিন্দু সাগরে পূর্ব্বে ঝরণার জল আসিত। এই হ্রদের অবস্থা দেখিয়া ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। এখন কেবল বর্ষাকালে ইহা জলপূর্ণ থাকে।

কেদারেশ্বর।

এই মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগে জলমগ্ন পঞ্চানন দেব আছেন, ইঁহার পাঁচটী মুখ। ইহার পার্শ্বেই গৌরীদেবীর মন্দির। এই দুটী মন্দিরের সম্মুখস্থিত কেদার গৌরী কুণ্ডের জল অতি সুন্দর। ভুবনেশ্বর বাসীগণ এখানেই স্নান করেন। ইহাতে একদিক দিয়া ঝরণার জল প্রবেশ করিতেছে এবং উচ্ছলিত অবস্থায় অন্যদিক দিয়া উহা বাহির হইয়া যাইতেছে।

মুক্তেশ্বর।

মুক্তেশ্বর মন্দিরের কারুকার্য্য এবং মোহনের চন্দ্রাতপ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রস্তরের উপর এমন সুন্দর কারুকার্য্য কুত্রাপি দেখা যায় না। ইহার সম্মুখে মুক্তেশ্বর কুণ্ড বিদ্যমান।

সিদ্ধেশ্বর।

সিদ্ধেশ্বরের মন্দির মুক্তেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে একটী কুণ্ড আছে তাহাকে "সিদ্ধ কুণ্ড" (বা মরিচ কুণ্ড, মরীচিকুণ্ড) বলে। কথিত আছে এই কুণ্ডের জল বন্ধ্যা স্ত্রী লোককে সেবন করাইলে সে অন্তঃস্বত্বা হয়। অশোকাষ্টমী উপলক্ষে পাণ্ডাগণ সর্ব্বসাধারণকে এই জল বিক্রয় করিয়া থাকে।

পরশু রামেশ্বর।

মন্দিরটীর সম্প্রতি জীর্ণ সংস্কার কার্য্য চলিতেছে। ইহার মনোজ্ঞ কারুকার্য্য দর্শন করিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

রাজা রাণী।

এই মন্দিরের কারুকার্য্যও অতি সুন্দর।

কপিলেশ্বর।

উৎকট ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার জন্য লোকে এই স্থানে হত্যা দিয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন সোমেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, ভাস্করেশ্বর প্রভৃতি অনেক মন্দির এবং গৌরীকুণ্ড, রামকুণ্ড, গঙ্গা যমুনা, পাপ নাশিনী, কপিলহ্রদ, ললিত কুণ্ড প্রভৃতি বহুসংখ্যক পবিত্র কুণ্ড এখানে বিদ্যমান আছে।

ভুবনেশ্বরের মন্দির।

ইহার উর্দ্ধতা ১২০ হাত এবং উহার চতুর্দ্দিক উর্দ্ধ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সিংহ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রথমে অরুণস্তম্ভ, তাহার পর ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, মোহন ও গর্ভগৃহ। নাটমন্দিরটী শালিনী কেশরীর পাটরাণী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। যিনি প্রাচীন হিন্দুগণের স্থপতি বিদ্যার পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করেন তিনি ভুবনেশ্বর মন্দির দর্শন করিয়া যান্। মন্দির গাত্রে বুটজুতা

পরিহিত সৈন্যের মূর্ত্তি সকল দেখিয়া মনে হয় প্রাচীন ভারতে বুটজুতার ব্যবহার জানা ছিল। সিংহ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া মন্দিরের উপরিস্থিত পতাকাকে প্রণাম করিতে হয়। তাহার পর যথাক্রমে গণেশ, গরুড় ও কৃষ্ণস্তম্ভ দর্শন করিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়।

লিঙ্গরাজের ব্যাস দৈর্ঘ্যে ৭ হাত ও বিস্তৃতিতে ৬ হাত। উহার চতুর্দ্দিক স্বর্ণ মণ্ডিত। ভুবনেশ্বর লিঙ্গাকার নহেন ছত্রাকার। উহা উচ্চতায় দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগে নৃসিংহদেব, নিশাগণেশ, নিশা-পার্ব্বতী, হরিহর, ভুবনেশ্বরী, সাবিত্রী, ভৈরবেশ্বর প্রভৃতি দেব ও দেবী মূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। নিশাগণেশ মূর্ত্তির অঙ্গের কারু কার্য্য অতি সুন্দর। ইহারই মধ্যে রন্ধনশালা আছে।

মন্দিরের একাংশে ভুবনেশ্বর দেবের প্রতিনিধি ধাতুময়ী ভোগমূর্ত্তি চন্দ্রশেখর দেব আছেন।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরে তিন শ্রেণীর পাণ্ডা আছেন। "বড় সেবক পাণ্ডা" বিন্দু সরোবরের জলে লিঙ্গরাজকে স্নান করাইয়া তাঁহাকে বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত করেন। "পূজা পাণ্ডাগণ" পূজা কার্য্য সমাধা করেন এবং ভোগ দেন। "মহাসূপকার" পাণ্ডাগণ ভোগ ও রন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন করেন।

ভুবনেশ্বরের নিত্যপূজা।

১। প্রাতে দুন্দুভি ধ্বনি ও দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া আরতি। ২। ৬ টার সময় দন্ত ধাবন। ৩। ৭ টার সময় স্নান ও বস্ত্র পরিধান। ৪। ৯ টার সময় নবনী ও মিষ্টান্ন দ্বারা বাল্য ভোগ। ৫। ১০ টার সময় খিচুড়ি পিঠা ও মিষ্টান্ন দ্বারা সকাল ভোগ। ৬। ১১ টার সময় পকড়ান্ন ভোগ (দধি ও লেবুর সহিত পান্ত ভাত) ৭। দ্বিপ্রহরের সময় অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা মধ্যাহ্ন ভোগ ও আরত্তি; ইহার পরে ৪টা পর্য্যন্ত মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। ৮। ৪ টার সময় দুন্দুভি ধ্বনি, আরতি ও জিলিপী ভোগ। ৯। সন্ধ্যাকালে জলাভিষেক, বস্ত্র পরিধান ও পুষ্পমালা চন্দনাদি দ্বারা বড় শৃঙ্গার বেশ। ১০। খাজা, গজা, মতিচুর, অন্ন ও পান দ্বারা সন্ধ্যাভোগ। ১১। সুগন্ধাদি লেপন ও মোহনভোগ। ১২। ইহার এক ঘণ্টা পরে গোপাল ভোগ। পকড়ান্ন ও দধিকে "গোপাল

ভোগ" বলে। ১৩। দুধ কলা জল পান ও পুষ্পদান। ১৪। আরতি। ১৫। খাট শয্যা ঠিক করিয়া পাণ্ডাগণ বলেন "দেব, দেবী আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" ইহার পর দরজা বন্ধ করা হয়।

ভুবনেশ্বরের মন্দির সংলগ্ন গৌরীদেবীর মন্দিরের প্রস্তরকারু কার্য্য অতীব মনোহর।

ভুবনেশ্বরের পর্ব্বাদি।

১। চন্দন যাত্রা—বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ায় ভুবনেশ্বরের প্রতিনিধি চন্দ্র শেখর দেব বিন্দু সাগরের মধ্যস্থিত জগতি মন্দিরে যান।

২। পরশুরামাষ্টমী—আষাড় মাসের শুক্লাষ্টমীতে চন্দ্রশেখর পরশুরামের মন্দিরে গমন করেন।

৩। যম দ্বিতীয়া—কার্ত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীতে চন্দ্রশেখর যমেশ্বরের মন্দিরে যান।

৪। প্রথমাষ্টমী যাত্রা—অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে পাপ নাশিনী তীর্থে যান।

৫। মাঘ সপ্তমী—মাঘ মাসের শুক্ল সপ্তমীতে চন্দ্রশেখর ভাস্করেশ্বরের মন্দিরে যান।

৬। রথ যাত্রা—চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে চন্দ্রশেখর রথারোহনে রামেশ্বরের মন্দিরে গমন করেন এবং তথায় ৫ দিন অতিবাহিত করেন।

ইহা ভিন্ন বসন্ত পঞ্চমী, দোল যাত্রা, জন্মাষ্টমী, বিজয়া দশমী ও কোজাগর পূর্ণিমার সময় নানারূপ উৎসব হইয়া থাকে।

ভুবনেশ্বরের প্রসাদ।

গোপাল-মন্ত্রে পূজা কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া ভুবনেশ্বরের ভোগকে মহা-প্রসাদ বলা হয় এবং পুরীতে জগন্নাথের প্রসাদ যেমন নীচ জাতি দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও তাহা বিনা সঙ্কোচে সেবিত হইতে পারে, উচ্চ জাতি কর্ত্তৃক ভুবনেশ্বরের অন্ন প্রসাদ ও তেমন জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে স্পৃষ্ট ও সেবিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা অন্যত্র নীত হইতে পারে না।



খণ্ডগিরি ।

ধউলি।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের দুই ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দয়ানদী তীরে 'ধবলী' বা 'ধৌলী' নামে একটী পাহাড় আছে, তাহার শিখর দেশে মহাদেব ও গণেশের মন্দির এবং একখণ্ড অশোক শিলালিপি আছে। ধর্ম্মাশোকের আদেশ লিপি ধউলি পর্ব্বত গাত্রে ক্ষোদিত থাকিয়া অদ্যাপি তাঁহার যশঃ ঘোষণা করিতেছে। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে ক্যাপটেন কিটো এই স্থান পরিদর্শন করেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ইহার কাহিনী সকলের গোচরীভূত করেন। পাহাড়ের উপরে কোশলগঙ্গা নামে একটী বাপী আছে।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি।

ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে তিন মাইল দূরে এই দুইটি বালুকা প্রস্তর গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাবৃত পাহাড় আছে। ইহার অতি নিকটে ব্যাঘ্র, হরিণ, ভল্লুক, প্রভৃতি হিংস্র জন্তুপূর্ণ জঙ্গল আছে। পাহাড় দুইটি পরস্পর সংলগ্ন অল্প পরিসর উপত্যকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু উহাদিগকে একটি পাহাড়ই বলা উচিত। উহাদের ভিতরে অসংখ্য গুহা আছে। কত অগাধ অর্থরাশি ব্যয় করিয়া এই সকল গুহা ক্ষোদিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। পূর্ব্বে ঐগুলিকে বৌদ্ধকীর্ত্তি বলিয়া মনে করা যাইত কিন্তু এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে ইহারা জৈনরাজ খারবেল কর্তৃক ক্ষোদিত। খারবেল "মহাসেখ বাহন" নামে অভিহিত ছিলেন। এবং তাঁহার রাজ্য পাটলি পুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইঁহার রাজধানি কলিঙ্গ নগরীতেই ছিল। "The capital of this monarch was at Kalinganagar, which it has been suggested was probably somewhere near Bhubaneswar" *Bengal District Gazetteer.* এতদ্ব্যতীত আহির নামক কলিঙ্গাধিপতি ও অনেক গুলি গুহা ক্ষোদিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল গুহার অভ্যন্তরে অনেক সময় দস্যু ও তস্করেরা অনায়াসে লুকাইয়া থাকে। পাহাড়ের নিম্নে একটি বাংলা ঘর আছে তথায় একজন পথ প্রদর্শক সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকে। তাহাকে সঙ্গে লইলে সে তত্রত্য সমস্ত পথ ঘাট দেখাইয়া ও যাবতীয় দ্রষ্টব্য পদার্থ বুঝাইয়া দেয়। ভুবনেশ্বর হইতে গোযান যোগে ঐ স্থানে যাওয়া যায়,

কিন্তু রাত্রিকালে বন্য জন্তুর উপদ্রব হেতু অরক্ষিত অবস্থায় বাহির হওয়া নিরাপদ নহে। খণ্ডগিরির তলদেশে বৈরাগী মঠ আছে। মঠের একটি স্থানে অনেক খড়ম সংগৃহীত আছে।

খণ্ডগিরি।

১২৩ ফিট উচ্চ এবং তথায় শতাধিক গুহা আছে। ইহাতে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গুপ্তগঙ্গা, (পাণ্ডারা বলেন অনেকক্ষণ হুলুধ্বনি করিলে এখানে গঙ্গাজল বাহির হয়) আকাশ গঙ্গা (ইহা ৪০ হাত গভীর) তেঁতুলি গুহা, নবমুনি গুহা, ধানভানা গুহা, অনন্ত গুহা, খণ্ডগিরি গুহা (খণ্ডপাথর) প্রভৃতি অনেক গুহা আছে। উপরস্থিত মন্দিরে বুদ্ধদেবের, পরেশনাথের এবং দ্বাদশভূজা দুর্গা দেবীর মূর্তি আছে। অনন্তগুহাতে অনেকগুলি মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে এবং তথায় পালি ভাষায় লিখিত একখণ্ড প্রস্তর বিদ্যমান আছে। আকাশ গঙ্গার পার্শ্বে ললাটেন্দু কেশরীর দেহাবশেষ যথায় রক্ষিত আছে, তাহা সিংহ দ্বার নামে অভিহিত।

উদয়গিরি।

১১০ ফিট উচ্চ; তাহার শিখর দেশ হইতে সূর্য্যের মনোজ্ঞ উদয় সর্ব্ব অগ্রেই নয়ন পথে পতিত হয় বলিয়া উহার নাম উদয়গিরি। এই পর্ব্বতে ব্যাঘ্র গুহা (দেখিলে মনে হয় যেন একটি ব্যাঘ্র মুখব্যাদান করিয়া আছে) ও হস্তীগুহা নামে দুইটী গুহা আছে। শেষোক্তটির ছাদ পতনোন্মুখ হওয়ায় ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট উড্‌বর্ণ সাহেব উহার তিনটি প্রস্তর স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া উহাকে ধ্বংস মুখ হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। রাণী হংসপুর, ছোট হাতী গুহা, জয়া বিজয়া গুহা, বড় ছাতা গুহা, সর্পগুহা, হরিদাস গুহা, জগন্নাথ গুহা প্রভৃতি অনেক গুহাও আছে। রাণী হংসপুর দ্বিতল এবং উহা দেখিতে অতি সুন্দর। ইহা ৪০ হাত দীর্ঘ ও ১১ হাত উচ্চ; দেখিতে ঠিক চক্‌ মিলানো বাড়ীর ন্যায়। হস্তী গুহায় একটি গণেশ মূর্ত্তি আছে। মাঘী সপ্তমীতে উদয় গিরির উপর একটি মেলা হইয়া থাকে। সেই দিন যাত্রীগণ এই গিরির উপর হইতে সূর্য্যোদয় দর্শন করিয়া থাকেন।



উদয় গিরি ।

খুর্দ্দা, অত্রি, সাক্ষীগোপাল, কপোতেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, আঠার নালা।

খুর্দ্দা রোড।

এখান হইতে খুর্দ্দায় যাওয়া যায়। পূর্ব্বে খুর্দ্দা পুরীরাজের রাজধানী ছিল; বর্ত্তমানে উহা পুরী জেলার একটি মহকুমা। খুর্দ্দা রোড ষ্টেসন হইতে একটি রেল লাইন মান্দ্রাজ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে ও অপরটি পুরী পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে।

অত্রি।

খুর্দ্দা হইতে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে একটি প্রস্রবণ আছে এবং তথায় মকর সংক্রান্তির দিনে একটি মেলা হয়। কথিত আছে এই প্রস্রবণের জল পান করিলে বন্ধ্যা নারী গর্ভবতী হয়।

সাক্ষীগোপাল।

গ্রামটি পুরী ষ্টেসন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে রতনচিরা নদীতীরে অবস্থিত। গুপ্ত বৃন্দাবন নামক সুবিস্তৃত উদ্যান মধ্যে সাক্ষী গোপাল দেবের ৭০ ফুট উচ্চ মন্দির। উহার প্রাঙ্গণে একটি পুষ্করিণী আছে। মন্দির মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চতুর্হস্ত পরিমিত উচ্চ মনোজ্ঞ মূর্ত্তি এবং তৎসম্মুখে শ্রীরাধিকা মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত। তীর্থ যাত্রীগণের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে জগন্নাথ দেব দর্শন করিয়া সাক্ষীগোপাল দর্শন না করিয়া আসিলে তীর্থের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই জন্য পুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময় সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া আসিতে হয়।

বিদ্যানগর (রাজমহেন্দ্রী) নিবাসী জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একদা প্রতিবেশী একজন ব্রাহ্মণ যুবককে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় পীড়িত হইয়া পড়েন। পীড়ার সময় যুবক সেই বৃদ্ধকে বিশেষ যত্ন সহকারে সেবা ও শুশ্রূষা করিয়া রোগমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া বৃদ্ধ তাঁহার কন্যার সহিত যুবকের বিবাহ দিবেন এই অঙ্গীকার করেন। বৃদ্ধ উচ্চ শ্রেণীর কুলীন এবং যুবক তাদৃশ কুল সম্পন্ন নহেন বলিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে বৃদ্ধ তাঁহাকে কন্যাদানে অসম্মত হন। যুবক গ্রামস্থ পঞ্চায়েতের নিকট অভিযোগ করিলে তাঁহারা সাক্ষী সহযোগের দ্বারা প্রস্তাবিত বিবাহ বিষয়ক প্রমাণ দিতে বলেন। বৃন্দাবনে ৺গোপাল জিউর শ্রীমন্দিরের সম্মুখে

ঐ কন্যা দান সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল স্মরণ করিয়া যুবক পুনরায় বৃন্দাবনে গমন করিয়া গোপাল জিউর নিকট হত্যা দিলেন এবং তাঁহাকে ঐ বিচারে সাক্ষ্য দিতে আসিবার জন্য একান্তমনে প্রার্থনা করিলেন। ভক্তাধীন গোপাল জিউ ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সম্মত হইয়া বলিলেন তুমি অগ্রে অগ্রে গমন করিবে আমি তোমার পশ্চাতে যাইতে থাকিব; আমার নুপুর শব্দে তুমি বুঝিবে যে আমি তোমার অনুসরণ করিতেছি কিন্তু তুমি পশ্চাতে ফিরিয়া যেন আমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিও না। তাহা হইলে আমি আর যাইব না, সেই স্থানেই থাকিব। পথে নুপুর গুলিতে বালুকা প্রবেশ করায় যুবক নুপুর ধ্বনি শুনিতে না পাইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া গোপাল জিউ আর অগ্রসর হন নাই, সেই স্থানেই রহিয়া গেলেন। উপায়ন্তর না দেখিয়া যুবক বিদ্যানগরে যাইয়া পঞ্চায়ৎগণকে সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া সেই স্থানেই সকলকে আসিতে অনুরোধ করিলেন; সেইরূপ হইলে গোপাল জিউ তাঁহাদের নিকট যুবকের কথাই যে সত্য এই সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। অনন্তর যুবকের সহিত বৃদ্ধার কন্যার বিবাহ কার্য্য যথাসময়ে সমাধা হইয়া গেল। সত্য কথা বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম "সাক্ষীগোপাল" ও "সত্য বাদী" হইয়াছিল। গ্রামটীর নাম ও এই জন্য সাক্ষীগোপাল বা সত্যবাদী হইয়াছে।

উৎকল রাজ পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চীরাজের একটি পরমাসুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহনার্থ অভিলাষী হন, কিন্তু তিনি জগন্নাথ দেবের সন্মার্জ্জকের কার্য্য করেন বলিয়া কাঞ্চীরাজ কন্যাদানে অসম্মতি প্রকাশ করেন। উৎকল রাজ কাঞ্চীরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিদ্যানগর হইতে সত্যবাদী গোপালের মূর্ত্তি আনিয়া কাঞ্চী বিজয়ের স্মৃতি চিহ্ন বা সাক্ষী স্বরূপ ১৪৯৭ খৃঃঅব্দে তাহা কটকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫১০ খৃঃঅব্দে চৈতন্য দেব কটকেই সাক্ষী গোপাল মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। মোগল রাজত্বের সময় সাক্ষীগোপাল মূর্ত্তি বর্ত্তমান সাক্ষীগোপাল (সত্যবাদী) নামক স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কথিত আছে সাক্ষীগোপাল মূর্ত্তি এক সময়ে পুরীতে বিরাজমান ছিলেন এবং তাঁহার ও জগন্নাথদেব উভয়েরই ভোগ এক সঙ্গেই হইত। প্রভু জগন্নাথদেব স্বপ্নযোগে বিজ্ঞাপিত করেন যে যাবতীয়

ভোগ সামগ্রী গোপাল দেব একাকীই আহার করেন; তিনি তাহার কিছুই পান না। সেই জন্য সাক্ষীগোপালের পৃথক ভোগের ব্যবস্থা হয়।

সাক্ষীগোপালের মূর্ত্তি দেখিতে অতীব সুন্দর। কথিত আছে কোনও সময় শ্রীক্ষেত্র রাজের পাটরাণী গোপালের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে নাসিকায় যদি উঁহার একটি নোলক থাকিত তাহা হইলে মূর্ত্তি আরও সমধিক সুন্দর দেখাইত। তিনি ভাবিয়া ছিলেন নাসিকার ছিদ্র থাকিলে আমি এখনই উঁহাকে আপনার নোলকটি পরাইয়া দিতাম। রাত্রে গোপালের স্বপ্ন আদেশ হইল, আমার নাকে ছিদ্র আছে মুক্তা পরিব। পরদিন পাটরাণী অতি সমারোহে তথায় আসিয়া মুক্তা পরাইয়া দিলেন—

"অদ্যাপি রাণীর মুক্তা বলিয়া খেয়াতি,
গোপাল পরেন নাকে কোন কোন তিথি॥"

কপোতেশ্বর।

উৎকল খণ্ডে লিখিত আছে পূর্ব্বকালে একটি সুপ্রসিদ্ধ কুশস্থলী ছিল, তাহাতে সকল জন্তুই বাস করিত। উহা বৃক্ষ ও জলাশয় বিহীন এবং পিশাচ-গণের বাসযোগ্য ছিল। মহাদেব বিষ্ণু সদৃশ সর্ব্বপূজ্য হইবেন কামনা করিয়া সেই কুশস্থলীতে তীব্র তপস্যা করিয়া কপোতের ন্যায় সূক্ষ্ম শরীরী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কপোতেশ্বর শিব হইয়াছে। ভক্ত বৎসল ভগবান প্রসন্ন হইয়া শিবকে ভগবানের সদৃশ পূজা ও সম্মানাদি পাইবার মত ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছিলেন এবং মহাদেবের তপঃ প্রভাবে কুশস্থলী বৃন্দাবন সদৃশ মনোরম ও তরুলতা শোভিতা হইয়াছিল। যাঁহারা কপোতেশ্বর শিবকে দর্শন ও পূজা করেন তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া পুরুষোত্তম গমনে সমর্থ হন। ইহা এক্ষণে কমল পুরের নিকট অবস্থিত। অগ্নি পুরাণের মতে কোনও সময়ে হরপার্ব্বতী কপোত কপোতীর রূপ ধারণ করিয়া বিহার করিয়াছিলেন বলিয়া শিবের এই নামের উৎপত্তি।

বিল্বেশ্বর।

কপোতেশ্বরের পূর্ব্বদিকে নীলাচলের নিকট সমুদ্রতীরে অবস্থিত। পাতাল-বাসী দৈত্যগণ মহীতল ভেদ করিয়া দ্বার নির্ম্মান পূর্ব্বক ভূলোকে আগমন

করিয়া জনগণের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ যাদব ও পাণ্ডবগণের সহিত সেই সময় শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তীর্থরাজ-সমুদ্রের জলে স্নান করিয়া ও নীলমাধবকে মনে মনে প্রণাম করিয়া সেই দৈত্যদ্বারে উপনীত হইয়াছিলেন। অনন্তর একটি বিল্বফল আনিয়া মহাদেবকে পূজা করিয়া সসৈন্য পাতাল প্রবেশ করিয়া দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পাতালের সেই অবরোধের জন্য একটি প্রাসাদ নির্ম্মান করিয়া ভগবান মহাদেবকে তথায় স্থাপিত করিয়া বলিয়াছিলেন "আপনি এখানে নিত্য বিরাজ করুন।" সেই অবধি শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠিত সেই মহাদেব বিল্বেশ্বর মহাদেব নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছেন। মানবগণ সেই পাপহন্তা মহাদেবকে দর্শন করিলে দুস্তর বিপৎসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সমুদয় অভিলষিত লাভ করিয়া থাকেন।

আঠার নালা।

দণ্ডভাঙ্গা নদীর উপরে অষ্টাদশ সংখ্যক ফোকর বিশিষ্ট সেতুকে আঠার নালা বলে। রাজা মৎস্য কেশরী ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। আঠার নালার সেতু হিন্দুগণের স্থপতি বিদ্যার নৈপুণ্যের একটী পরিচয়। যাজপুরের নিকট এইরূপ একটি এগার নালা আছে।

কথিত আছে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন এবং সেতু-বন্ধনে পুনঃপুনঃ বিফল প্রযত্ন হইয়া জগন্নাথদেবের আদেশ ক্রমে নিজের অষ্টাদশ পুত্রের মস্তক এই নদীগর্ভে উপহার দিয়া তবে সেতু বন্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণের মতে চৈতন্য দেবের পারাপারের জন্য জগন্নাথদেব এক রাত্রি মধ্যে এই সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। দণ্ডভাঙ্গা নদীটি এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই নদীর নাম ভার্গী নদী ছিল। নিতাই চৈতন্যদেবের দণ্ড এখানে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম দণ্ড ভাঙ্গা হইয়াছে। স্থল পথে এই স্থান হইতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া তীর্থযাত্রী-গণ আনন্দে বিভোর হন। আঠার নালার নিকট ঝাড়কুণ্ড বৈদ্যনাথ শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

পুরী।

ইহা কলিকাতা হইতে ৩১১ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত। পুরীই পুরী জেলার প্রধান নগর। পুরীজেলায় দুইটী মহকুমা আছে পুরী ও খুর্দ্দা। ইহার দক্ষিণে চিল্কা হ্রদ ও মান্দ্রাজ প্রেসীডেন্সী।

পুরী সহর দৈর্ঘ্যে তিন ক্রোশ ও প্রস্থে দুই ক্রোশ। ইহার এক একটী পাড়াকে এক একটী "সাহী" বলে যথা মার্কণ্ডসাহী, দোলমণ্ডসাহী ইত্যাদি। শ্রীমন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী যে সুবিস্তৃত রাজপথ গুণ্ডিচা বাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহার নাম বড় দাণ্ড বা বড় দাঁড়। দাণ্ড বা দাঁড় অর্থে রাস্তা। এই সুপ্রশস্ত রাজপথের উপর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুরীর রাজপ্রাসাদও এই রাজপথের পার্শ্বদেশেই অবস্থিত। অপর একটী রাজপথ সমুদ্রের অভিমুখে স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত প্রসারিত।

স্বর্গদ্বার হইতে চক্রতীর্থ পর্য্যন্ত বালুকাভূমির উপর অধুনা বহু বিশালকায় অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থান গবর্ণমেণ্টের খাস মহলের অন্তর্গত এবং ইহাকে বালুখণ্ড ষ্টেট বলে। কলেক্টর সাহেব এই স্থানের জমী ৩০ হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত মিয়াদে বাস করিবার চুক্তিতে সাধারণকে উচ্চ খাজনায় পাট্টা দিয়া থাকেন।

পুরীধাম নীলাচল, পুরী, পুরুষোত্তম, শ্রীক্ষেত্র, শঙ্খ ক্ষেত্র, কেবল ক্ষেত্র, দশাবতার ক্ষেত্র, ঠাকুর বাড়ী নামে খ্যাত। মাধবের লীলা ভূমি বলিয়া ইহাকে লীলাচল কহে।

ইতিহাস।

অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। যবনগণ তাঁহাদিগের রাজ্য আক্রমণ করেন। কেশরী বংশের আদি পুরুষ

যযাতি কেশরী যবনগণকে বিতাড়িত করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করেন। ইনিই মন্দিরাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে অনেক অর্থব্যয় করিয়া যে সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কেশরী বংশের অনন্ত কেশরী, অলাবু কেশরী, ললাটেন্দু কেশরী, মৎস্য কেশরী, এই কয়জন রাজা বিখ্যাত। ইহার পরে গঙ্গা বংশীয়গণ রাজত্ব করেন। গঙ্গা বংশের আদি পুরুষ রাজা চোরগঙ্গা জগন্নাথ দেবের প্রাত্যহিক বিবরণমূলক মণ্ডল-পঞ্জী ('মাদ্‌লা পাঁজী) লিখাইবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন। অদ্যাবধি তালপত্রে "মাদলা পাঁজী" লিখিত হইয়া থাকে। এই পঞ্জিকা দীর্ঘ দীর্ঘ তালপত্রে লিখিত হইয়া মর্দ্দলাকারে বদ্ধ থাকায় উহার নাম মাদলা পঞ্জিকা হইয়াছে। মাদলা পাঁজিই উড়িষ্যার ইতিবৃত্ত। ইহাতে জগন্নাথ মন্দিরের ও উড়িষ্যার নরপতিগণের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। রাজা চোরগঙ্গের সময়ে উড়িষ্যারাজ্য গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বংশে অনিয়ঙ্ক ভীমদেব নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। রাজা কপিলেন্দ্র দেব সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। এবং রাজা পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চীরাজকে স্ববশে আনয়ন করেন। রাজা প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং তিনি তাঁহার একজন প্রধান ভক্ত বলিয়া গণ্য ছিলেন। রাজা মুকুন্দদেব উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নৃপতি। তাঁহার নিকট হইতে মুসলমানগণ বিনা যুদ্ধে তাঁহার রাজ্য হস্তগত করেন। অনন্তর মহারাষ্ট্রীয়গণ মুসলমানগণের নিকট হইতে যুদ্ধ সূত্রে উহা প্রাপ্ত হন। খুর্দ্দা পুরীরাজার রাজধানী ছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ পুরীরাজার খুর্দ্দা কেল্লা ব্যতীত তাঁহার যাবতীয় ভূসম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে খুর্দ্দা রাজ ইংরাজদিগের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করেন কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার উভয়ের মধ্যে শত্রুতার সঞ্চার হয়। অনন্তর ইংরাজগণ খুর্দ্দার রাজার সমস্ত সম্পত্তি খাস মহল ভুক্ত করিয়া লন। ১৮০৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজ রাজ জগন্নাথদেবের সেবার জন্য উপযুক্ত আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া রাজাকে পুরীতে থাকিবার অনুমতি প্রদান করেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে পুরীর রাজা ভাগ্যবিপর্য্যয়ে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া আজীবন দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র জগন্নাথদেবের সেবাইত স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

চিরন্তন প্রথা অনুসারে রথযাত্রার নির্দ্দিষ্ট দিনে পুরীর রাজাকে স্বর্ণমণ্ডিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা রথের সম্মুখস্থ পথ পরিষ্কার করিয়া তাহার উপর গোময় মিশ্রিত জল সিঞ্চন করিতে হয়।

পুরীর বর্ত্তমান রাজার নাম মুকুন্দদেব, ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে কেহ রাজ প্রাসাদের বহির্দ্দেশে দৃষ্টি গোচর করিতে পায় না; রথের দিনে তাঁহাকে দেখিবার জন্য তীর্থ যাত্রীগণ অত্যন্ত উৎসুক হইয়া থাকেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি হয় নাই। সম্প্রতি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

ঠাকুর বাড়ীর রাজা বলিয়া পুরীর রাজা "ঠাকুর রাজা" নামে আখ্যাত। সাধারণে ইঁহাকে 'দেবরাজ' বা 'চলন্তিদেব' ও বলে।

জগন্নাথ দেবের প্রকাশ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যদুবংশ ধ্বংশ সাধন হইলে গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকেই সকল অনর্থের মূল মনে করিয়া এই অভিসম্পাত প্রদান করেন যে অল্পকালের মধ্যেই যদুকুল ও নির্ম্মূল হইবে। গান্ধারীর সে অভিসম্পাত সিদ্ধির বিবরণ এইরূপ ঃ—একদা যদুবংশীয় কতকগুলি দুষ্টবুদ্ধি বালক জাম্বুবতীর পুত্র শাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া তদীয় উদর প্রদেশে একখণ্ড লৌহ বাঁধিয়া দিয়া তাহার গর্ভ হইয়াছে এইরূপ প্রতীতি জন্মাইয়া বিশ্বামিত্র কণ্ব ও নারদ মুনির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে এই রমণীর গর্ভে কি সন্তান উৎপন্ন হইবে। মুনিগণ বালকগণের পরিহাস চাতুরী বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট চিত্তে এই অভিসম্পাত প্রদান করেন যে স্ত্রীবেশধারী বালক অচিরে এক মুষল প্রসব করিবে এবং তাহা যদুবংশেরই কুলনাশক হইবে। মুনি বাক্য অমোঘ, লঙ্ঘনীয় নহে! সত্য সত্যই শাম্ব মুষল প্রসব করিলেন। মুষলটী কোনও রূপে ক্ষয় ও নষ্ট করিতে না পারিলে যদুবংশের ধ্বংশ অনিবার্য্য হইবে এই আতঙ্কে তাহারা একটী হ্রদের ভিতরে পাষাণের উপর ঘসিয়া ক্ষয় করিয়া তাহার সামান্য যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল তাহা সেই হ্রদেই নিক্ষেপ করিল। মুষলের ক্ষয়াবশেষ হইতে সেই হ্রদে যে নল খাগড়ার উৎপত্তি হইল, তাহা হইতে নির্ম্মিত ইষু সাহায্যে যদুবংশের নিপাত সাধন হইয়াছিল। পরিত্যক্ত লৌহ খণ্ড একটী মৎস্য গ্রাস করিয়াছিল। ঐ মৎস্য এক ধীবরের জালে পতিত

যযাতি কেশরী যবনগণকে বিতাড়িত করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করেন। ইনিই মন্দিরাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে অনেক অর্থব্যয় করিয়া যে সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কেশরী বংশের অনন্ত কেশরী, অলাবু কেশরী, ললাটেন্দু কেশরী, মৎস্য কেশরী, এই কয়জন রাজা বিখ্যাত। ইহার পরে গঙ্গা বংশীয়গণ রাজত্ব করেন। গঙ্গা বংশের আদি পুরুষ রাজা চোরগঙ্গা জগন্নাথ দেবের প্রাত্যহিক বিবরণমূলক মণ্ডল-পঞ্জী ('মাদ্‌লা পাঁজী) লিখাইবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন। অদ্যাবধি তালপত্রে "মাদলা পাঁজী" লিখিত হইয়া থাকে। এই পঞ্জিকা দীর্ঘ দীর্ঘ তালপত্রে লিখিত হইয়া মর্দ্দলাকারে বদ্ধ থাকায় উহার নাম মাদলা পঞ্জিকা হইয়াছে। মাদলা পাঁজিই উড়িষ্যার ইতিবৃত্ত। ইহাতে জগন্নাথ মন্দিরের ও উড়িষ্যার নরপতিগণের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। রাজা চোরগঙ্গের সময়ে উড়িষ্যারাজ্য গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বংশে অনিয়ঙ্ক ভীমদেব নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। রাজা কপিলেন্দ্র দেব সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। এবং রাজা পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চীরাজকে স্ববশে আনয়ন করেন। রাজা প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং তিনি তাঁহার একজন প্রধান ভক্ত বলিয়া গণ্য ছিলেন। রাজা মুকুন্দদেব উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নৃপতি। তাঁহার নিকট হইতে মুসলমানগণ বিনা যুদ্ধে তাঁহার রাজ্য হস্তগত করেন। অনন্তর মহারাষ্ট্রীয়গণ মুসলমানগণের নিকট হইতে যুদ্ধ সূত্রে উহা প্রাপ্ত হন। খুর্দ্দা পুরীরাজার রাজধানী ছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ পুরীরাজার খুর্দ্দা কেল্লা ব্যতীত তাঁহার যাবতীয় ভূসম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে খুর্দ্দা রাজ ইংরাজদিগের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করেন কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার উভয়ের মধ্যে শত্রুতার সঞ্চার হয়। অনন্তর ইংরাজগণ খুর্দ্দার রাজার সমস্ত সম্পত্তি খাস মহল ভুক্ত করিয়া লন। ১৮০৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজ রাজ জগন্নাথদেবের সেবার জন্য উপযুক্ত আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া রাজাকে পুরীতে থাকিবার অনুমতি প্রদান করেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে পুরীর রাজা ভাগ্যবিপর্য্যয়ে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া আজীবন দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র জগন্নাথদেবের সেবাইত স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

চিরন্তন প্রথা অনুসারে রথযাত্রার নির্দ্দিষ্ট দিনে পুরীর রাজাকে স্বর্ণমণ্ডিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা রথের সম্মুখস্থ পথ পরিষ্কার করিয়া তাহার উপর গোময় মিশ্রিত জল সিঞ্চন করিতে হয়।

পুরীর বর্ত্তমান রাজার নাম মুকুন্দদেব, ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে কেহ রাজ প্রাসাদের বহির্দ্দেশে দৃষ্টি গোচর করিতে পায় না; রথের দিনে তাঁহাকে দেখিবার জন্য তীর্থ যাত্রীগণ অত্যন্ত উৎসুক হইয়া থাকেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি কেহ নাই। সম্প্রতি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

ঠাকুর বাড়ীর রাজা বলিয়া পুরীর রাজা "ঠাকুর রাজা" নামে আখ্যাত। সাধারণে ইঁহাকে 'দেবরাজ' বা 'চলন্তিদেব' ও বলে।

জগন্নাথ দেবের প্রকাশ।

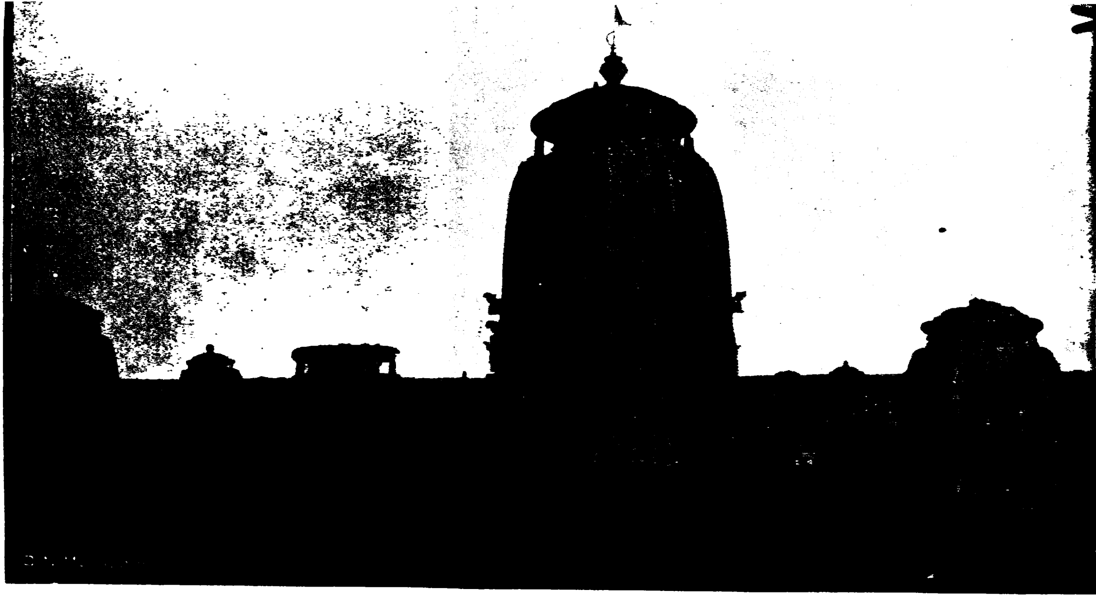
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যদুবংশ ধ্বংশ সাধন হইলে গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকেই সকল অনর্থের মূল মনে করিয়া এই অভিসম্পাত প্রদান করেন যে অল্পকালের মধ্যেই যদুকুল ও নির্ম্মূল হইবে। গান্ধারীর সে অভিসম্পাত সিদ্ধির বিবরণ এইরূপ :— একদা যদুবংশীয় কতকগুলি দুষ্টবুদ্ধি বালক জাম্বুবতীর পুত্র শাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া তদীয় উদর প্রদেশে একখণ্ড লৌহ বাঁধিয়া দিয়া তাহার গর্ভ হইয়াছে এইরূপ প্রতীতি জন্মাইয়া বিশ্বামিত্র কণ্ব ও নারদ মুনির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে এই রমণীর গর্ভে কি সন্তান উৎপন্ন হইবে। মুনিগণ বালক-গণের পরিহাস চাতুরী বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট চিত্তে এই অভিসম্পাত প্রদান করেন যে স্ত্রীবেশধারী বালক অচিরে এক মূষল প্রসব করিবে এবং তাহা যদুবংশেরই কুলনাশক হইবে। মুনি বাক্য অমোঘ, লঙ্ঘনীয় নহে! সত্য সত্যই শাম্ব মূষল প্রসব করিলেন। মূষলটী কোনও রূপে ক্ষয় ও নষ্ট করিতে না পারিলে যদুবংশের ধ্বংশ অনিবার্য্য হইবে এই আতঙ্কে তাহারা একটী হ্রদের ভিতরে পাষাণের উপর ঘসিয়া ক্ষয় করিয়া তাহার সামান্য যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল তাহা সেই হ্রদেই নিক্ষেপ করিল। মূষলের ক্ষয়াবশেষ হইতে সেই হ্রদে যে নল খাগড়ার উৎপত্তি হইল, তাহা হইতে নির্ম্মিত ইষু সাহায্যে যদুবংশের নিপাত সাধন হইয়াছিল। পরিত্যক্ত লৌহ-খণ্ড একটী মৎস্য গ্রাস করিয়াছিল। ঐ মৎস্য এক ধীবরের জালে পতিত

হয়, জয়া নামক এক ব্যাধ সেই মৎস্য ক্রয় করিয়া তাহার উদর মধ্য হইতে প্রাপ্ত লৌহখণ্ড আপন ধনুকের তীরে ব্যবহার করে। একদা কৃষ্ণ একটী বৃক্ষের তলে বসিয়াছিলেন এমন সময় জয়া ব্যাধ মৃগ ভ্রমে সেই বাণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বধ করে। নিজভ্রম বুঝিতে পারিয়া জয়া নিজ দুস্কৃতি-জনিত বিলাপ করিতে থাকিলে তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে ত্রেতাযুগে আমি রামরূপে বিনাদোষে তোমার পিতা বালিকে বধ করিয়াছিলাম আজ আমার হত্যা ব্যাপারে তাহার সমুচিত প্রতিফল হইল। তুমি এ জন্য দুঃখ করিও না ইহা বিধাতার অখণ্ডনীয় বিধান। তুমি হস্তিনাপুরে গমন করিয়া পাণ্ডবগণকে আমার মৃত্যু সংবাদ বিজ্ঞাপিত কর। জয়ার প্রমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিধন বার্ত্তা অবগত হইয়া পাণ্ডবগণ উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শবদেহ দাহ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন কিন্তু সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর তৎকালে এই দৈববাণী হইয়াছিল যে "সাক্ষাৎ নারায়ণের দেহ দগ্ধ হইবার নহে, ইহা সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, কলিযুগে ইনিই দারুব্রহ্ম জগন্নাথ রূপে আখ্যাত হইবেন।"

জগন্নাথদেবের প্রকাশ সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ।

উৎকল খণ্ডে লিখিত আছে যে সত্যযুগে অবন্তীনগরে সূর্য্যবংশ সম্ভূত ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক ধর্ম্মাত্মা নরপতি ছিলেন। একদা তিনি নিজ পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করেন যে এরূপ ক্ষেত্রধাম কোথায় আছে যেখানে জগন্নাথদেবকে চর্ম্মচক্ষু সহযোগে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে সমর্থ হওয়া যায়। পুরোহিত প্রত্যুত্তরে কহিলেন ভারতবর্ষে বিখ্যাত ওড্রদেশে দক্ষিণ সমুদ্রতীরে পুরুষোত্তম নামক এক উত্তম ক্ষেত্র বিরাজমান আছে। সেখানে কারণ-সলিল-পূর্ণ-রৌহিন কুণ্ডের তীরে সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ নীলকান্তমনি নির্ম্মিত ভগবান বাসুদেবের মনোহর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। তথ্য সংগ্রহণার্থ রাজা তৎক্ষণাৎ আপন পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে তথায় প্রেরণ করিলেন।

বিদ্যাপতি তদনুসারে রথারোহণে মহানদী প্রভৃতি সুদুস্তর নদী অতিক্রম করিয়া নীলাচল পর্ব্বতে উপনীত হইয়া, বিশ্বাবসু নামে এক বৃদ্ধ শবরকে তথায় দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার সহিত পরিচিত হইলেন। বিশ্বাবসু বিদ্যাপতিকে রৌহিণকুণ্ড, অক্ষয়বট এবং জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি যথাক্রমে দর্শন করাইলেন।



ভুবনেশ্বর

অনন্তর তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি যে এক্ষেত্রে শুভাগমন করিবেন তাহা এখানে জনশ্রুতি রূপে প্রচলিত আছে। বিদ্যাপতি জগন্নাথদেবকে ভক্তিভরে যথাবিহিত পূজা করিয়া বৃদ্ধ শবরের আতিথ্য স্বীকার করিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হইলে তীর্থরাজ সমুদ্রের জলে অবগাহনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মাধবকে প্রণাম পূর্ব্বক অবন্তীনগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে পদ্মনাভ ব্রহ্মা ভগবদ্দর্শনে তথায় আগমন করিয়া দেখিলেন যে একটী বায়স পিপাসার্ত্ত হইয়া আসিয়া কারণ-বারি-পরিপূর্ণ রৌহিনকুণ্ডে নিমজ্জিত হইয়া শঙ্খ, চক্র, গদা পানি অবস্থায় প্রভুর পার্শ্বে অবস্থিত হইল। বায়সের এবম্বিধ আশ্চর্য্যভাব অবলোকন করিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন, সৃষ্টি ব্যাপার এইরূপে উত্তরোত্তর প্রক্ষীণ হইতে থাকিবে। যমরাজ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অজ্ঞান পাপাসক্তগণও অনায়াসে নির্ব্বাণলাভের অধিকারী হয় দেখিয়া স্বীয় অধিকার ধ্বংশের সংশয়ে ব্যাকুল হইলেন এবং নীলপর্ব্বতে মাধবকে দর্শন, ভজন ও পূজা করিয়া যাহাতে স্বীয় অধিকার অটুট ও অখণ্ডনীয় ভাবে থাকে তাহার প্রার্থনা করিলেন। নারায়ণের ইঙ্গিতে লক্ষ্মী তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন যে তুমি অপর কর্ম্ম-ভূমির উপর আধিপত্য লাভের অধিকারী হও এখানকার প্রাণিগণ তোমার আয়ত্তাধীন হইবে না। এই পুণ্য ক্ষেত্রের মৃতদিগের উপর তোমার কোন অধিকার রহিবে না। লক্ষ্মী ব্রহ্মাকে আরও বলিলেন ভগবান শরণাগত জনের ক্লেশ রাশি অনুকম্পা বশে দূর করেন সেই জন্য যমরাজের পূজায় একান্ত প্রীত হইয়া তাঁহার প্রার্থনা অনুসারে তিনি এই অত্যজ্য ক্ষেত্রে সুবর্ণ বালুকায় আবৃত অবস্থায় চির বিরাজমান থাকিবেন, পরে পরমভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া ভগবানকে প্রীত করিলে তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে একটী দারুতে স্বীয় লীলাতনু প্রকাশিত করিবেন। বিশ্বকর্ম্মা রচিত ঐ দারুময় মূর্ত্তি তুমি ভক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠা করিবে। বিদ্যাপতি স্বদেশে প্রত্যাগত হওয়ার পর সায়ং কালীন পূজার জন্য দেবগণ সমাগত হইলে যমরাজের প্রার্থনা অনুসারে সমুদ্রের বালুকা রাশি ভগবান পুরুষোত্তমকে ও রৌহিন কুণ্ডকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিল। দেবগণ তাহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইলে এই আকাশ বাণী হইল যে ভগবান দারু ব্রহ্মরূপে মর্ত্তে অবতীর্ণ হইবেন।

এদিকে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যাপতি মুখে ভগবান পুরুষোত্তম দেবের অলৌকিক বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে অর্চনা করিবার উদ্দেশে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। সেই সময়ে নারদ ঋষি তাঁহার সমক্ষে সমাগত হইয়া কহিলেন আপনার অসীমগুণে মুনি ঋষিগণ এমন কি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। আমি আপনাকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ও তত্রস্থ তীর্থ প্রভৃতি প্রদর্শন করাইবার জন্য এই স্থানে আগমন করিয়াছি। স্বয়ং নারায়ণ ও আপনাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য রূপচতুষ্টয়ে বিরাজমান হইবেন। রাজা ও নারদ' ঋষি বিদ্যাপতির সহিত উৎকল দেশে গমন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তাঁহারা কুশস্থলীতে কপোতেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া ক্ষেত্র ধামের সীমায় উপস্থিত হইলে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের বাম চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। অমঙ্গল সূচক বাম চক্ষু স্পন্দনের কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় নারদ বলিলেন মহারাজ শুভকার্য্য সর্ব্বদাই বিঘ্ন সঙ্কুল, বিদ্যাপতির প্রত্যাবর্ত্তের পর দিবসেই সন্ধ্যাকালে ভগবান স্বর্ণ বালুকা কণায় আবৃত হইয়া পাতালে অন্তর্হিত হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া মহারাজা নিদারুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। নারদ অশেষ প্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা চ্ছলে বলিলেন লোক পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ সংঘটিত হইবে জানিয়াই আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইহা ও বলিয়া দিয়াছিলেন যে যমরাজের প্রার্থনা অনুসারে নীলমাধব হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়াছেন বলিয়া যেন রাজা বিলাপ না করেন। তিনি সেই ক্ষেত্রে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন। আপনি নিশ্চয়ই দারুব্রহ্ম বিষ্ণুমূর্ত্তি নিজ চক্ষে দর্শন করিতে পারিবেন। অতএব হে রাজন আপনি কোন সন্দেহ করিবেন না। আপনার মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। রাজা শোক সম্বরণ করিয়া নারদ ঋষির সহিত নীলকণ্ঠ শিব ও নরসিংহ মুর্ত্তি দর্শন করিলেন। নারদ তাঁহাকে অক্ষয় বটের মূল প্রদেশ হইতে পশ্চিমদিকে নৃসিংহদেবের উত্তরাংশে যে স্থানে প্রভু মাধব অবস্থান করিতেন এবং যথায় তিনি পুনরায় আবির্ভূত হইবেন সেই পুণ্য ক্ষেত্র স্থান তাঁহাকে প্রদর্শন করাইলেন, অনন্তর রাজা জগন্নাথদেব সেই স্থানে বিদ্যমান আছেন মনে করিয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। এই সময় এই আকাশ বাণী হইল যে হে নৃপবর, তুমি মহর্ষি নারদ ঋষির উপদেশ অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর।

ইতিপূর্ব্বে পদ্মনাভ ব্রহ্মা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ ও মানব মাত্রের মঙ্গল বিধান জন্য নরসিংহ ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নারদের অনুমতি ক্রমে বিশ্বকর্ম্মার পুত্র একটী অপূর্ব্ব মনোজ্ঞ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন তাহা পশ্চিমাভিমুখী ও পঞ্চদ্বার বিশিষ্ট, কথিত আছে যে পাঁচদিনের মধ্যেই উহার নির্ম্মাণ কার্য্য সামাধা হয়। মহর্ষি নারদ নরসিংহদেবের রমণীয় প্রতিমা তথায় স্থাপন করিলেন। পরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মহর্ষি নারদ সমভি-ব্যাহারে মহেন্দ্র সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন যে আমি সম্প্রতি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, আমাকে তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন; দেবরাজ বলিলেন তোমার এই ত্রৈলোক্য পাবন মহৎ কার্য্যে আমরা যথাসাধ্য সহায়তা করিব। অনন্তর ভগবান ও আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে পাতালে প্রবেশানন্তর ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিবার জন্য আপনি পুনরায় ভূমণ্ডলে দারুময় মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইব, অতএব তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর।

যথাবিধি বিধানে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হইলে, রাত্রি শেষ প্রহরে রাজা ধ্যান যোগে বিষ্ণু মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলেন। নারদ বলিলেন, হে নৃপ, যখন অরুণোদয় সময়ের স্বপ্নযোগে ভগবানের দর্শন লাভ প্রাপ্ত হইয়াছ তখন ঐ স্বপ্ন দশ দিবসের মধ্যেই যে অভীপ্সিত ফলপ্রসূ হইবে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

একদিন রাজা সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে সমুদ্রতীরে সহসা একটী বিশাল-বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, উহার অগ্রভাগ সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট ও মূলদেশ তীরে সংলগ্ন রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের শবদেহ বাঁকা মোহানায় সংলগ্ন হইয়া সমুদ্র বল্লির মধ্যে প্রোথিত অবস্থায় বিল্ববৃক্ষ রূপে পরিণত হইয়াছিল। রাজা ও নারদ তথায় গমন করিয়া সেই শঙ্খ চক্র চিহ্নিত চতুর্ভুজ স্বরূপ চতুঃশাখা সম্পন্ন বৃক্ষরাজকে দর্শন করিলেন। অনন্তর তাহা মহাবেদীর উপর স্থাপিত করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করিলেন। এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষ্ণু প্রতিমা কি প্রকারে নির্ম্মিত হইবে উভয়ে এই চিন্তা ও আলোচনায় নিমগ্ন আছেন এমন সময়ে আকাশ বাণী হইল যে ভগবান স্বয়ংই স্বীয় প্রতিমূর্ত্তি প্রকটিত করিবেন। এই যে বৃদ্ধ পুরুষকে উপস্থিত দেখিতেছ উঁহাকে গৃহ অভ্যন্তরগত করাইয়া দ্বারদেশ বন্ধ

করিয়া দিবে পরে তোমরা উহার বহির্ভাগে বাদ্য করিতে থাকিবে, কারণ ঘণ্টা শব্দ কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিলে বধিরতা, অন্ধতা ও অপত্যনাশ অবশ্যম্ভাবী। বৃদ্ধটী তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন আপনি স্বপ্নযোগে যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন আমিই তাহা নির্ম্মাণ করিয়া দিব। প্রতিমা নির্ম্মাণের গৃহ পঞ্চদশ দিবস রুদ্ধার্গল অবস্থায় রহিল। অনন্তর জগন্নাথদেব, বলরাম, সুভদ্রা ও চক্রেরসহিত দিব্য সিংহাসনে আবির্ভূত হইলেন। জগন্নাথদেবের হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম চিহ্ন বিরাজিত। অনন্তদেব গদা মূষল চক্র ও বজ্রচিহ্ন ধারণ করিয়া আছেন, চৈতন্য রূপিনী লক্ষ্মী সুভদ্রা একহস্তে বরপদ্ম ও হস্তান্তরে অভয় ধারণ করিয়া বিরাজমানা; এবং সুদর্শন চক্র বিষ্ণুহস্তে বিরাজ করিতেছেন। অনন্তর পুনরায় এই আকাশ বাণী হইল যে মূর্ত্তিগুলিকে পট্টবস্ত্রে আবৃত করিয়া চিত্রচাতুর্য্যে যথাবর্ণে রঞ্জিত কর এবং প্রতি বৎসরই মূর্ত্তিগুলির অভিনব অঙ্গ সংস্কার সাধন করিবে। নীল পর্ব্বতের শিখরদেশে কল্প বৃক্ষের বায়ুকোণে একশত হস্ত দূরে প্রতিষ্ঠিত নরসিংহদেবের উত্তর অংশের বিস্তীর্ণ স্থানের উপর সহস্র হস্ত উন্নত এক সুদৃঢ় মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে ঐ দেব বিগ্রহ স্থাপিত করিবে। অনন্তর মহর্ষি নারদ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন! এইস্থানে থাকিয়া দেবতার আরাধনা করিতে থাক, আমি ইত্যবসরে ব্রহ্মার সমীপে গমন করিয়া মুরারির প্রকাশ সম্বন্ধে সমস্ত রহস্য তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত করি। রাজা কহিলেন, হে মুনিবর, কিঞ্চিত কাল এ স্থানে অপেক্ষা করুন, প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও তাহার মধ্যে রত্নবেদী প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাধা করিয়া আমিও আপনার সহিত ব্রহ্মার সকাশে গমন করিব। ভারতবর্ষের সমুদয় রাজার সমবেত আনুকূল্যে অজস্র অর্থব্যয়ে অত্যুচ্চ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইলে, নারদ ও রাজা ব্রহ্মার সকাশে গমন করিলেন। ব্রহ্মা সমবেত দেবগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন আমার এক পরার্দ্ধমানকাল ব্যাপিয়া এক সময়ে এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভগবান নীলকান্তি মণিময় দেহ অবলম্বন করিয়া লীলা করিয়াছিলেন। এবং সম্প্রতি আমার দ্বিতীয় পরার্দ্ধকালে তিনি পুনরায় দারু মূর্ত্তিতে তথায় প্রকটিত হইয়াছেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রাসাদে প্রভুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমিও তথায় গমন করিব। তোমারও তথায় গমন কর। এবং দেব প্রতিষ্ঠার সামগ্রী সম্ভার আহরণ করিবার জন্য নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন অগ্রেই গমন করুন।

দেবগণ ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত ক্ষেত্রধামে আসিয়া নৃসিংহদেবকে নমস্কার করিলেন। ইত্যবসরে নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহার আদেশ মত নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উপযোগী দ্রব্যরাজি যথাবিধি আয়োজন করিলেন। শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা তিন খানি সুন্দর রথ নির্ম্মাণ করিলেন; প্রথম খানি বাসুদেবের জন্য, উহা গড়ুর ধ্বজ চিহ্নিত; দ্বিতীয় খানি সুভদ্রাদেবীর, উহা পদ্মধ্বজ চিহ্নিত ও তৃতীয় খানি বলভদ্রের.দর্পণ (তাল) ধ্বজ চিহ্নিত। যে দিবস হইতে প্রভুগণ এই রথে আগমন করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে এই উৎসব রথযাত্রা বা গুণ্ডিচা উৎসব নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে।

ইন্দ্রদ্যুম্নের অনুপস্থিতি সময়ে গল নামে এক মহীপাল মাধব নামে এক দারুময়ী প্রতিমা মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া মাধবকে তথায় স্থানান্তরিত করিলেন। ইহাতে গলরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে ইন্দ্রদ্যুম্ন এই সুবৃহৎ মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন এবং দেবাদিদেব জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠার জন্য যথোচিত আয়োজন করিতেছেন তখন তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন আমি ভগবান জনার্দ্দনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যখন ব্রহ্মলোকে গমন করিব তখন আপনি একান্ত মনে এই জগৎপতির যথাবিধি সেবা করিবেন।

প্রতিষ্ঠার আয়োজন কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে ব্রহ্মা স্বর্গ হইতে তথায় অবতীর্ণ হইলেন এবং জগন্নাথদেব, বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্রকে রথে আনয়ন করিয়া স্তব সহকারে তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা করিলেন, 'হে জগতের আধার আপনি কৃপা করিয়া এই প্রাসাদ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউন্ এবং সম্যক্ স্থিরভাবে অবস্থান করুন।' তদনন্তর জগন্নাথদেবকে স্নান করাইয়া বৈশাখ মাসে পুষ্যা-যোগ-যুক্ত শুক্লাষ্টমী তিথিতে বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন পূজাদি দ্বারা পুরুষোত্তমকে প্রসন্ন করিয়া নারদ ঋষির সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্যযুগের রাজা কিন্তু কৃষ্ণবলরাম, দ্বাপর যুগের অবতার, এ অবস্থায় একটু অসামঞ্জস্যের ভাব স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। কিন্তু মহামহো পাধ্যায় শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র মহোদয় বলেন যে রামকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম কেবল

নরদেহধারী কৃষ্ণ বলরামের নাম নহে। ইহা ভগবানেরই নামান্তর মাত্র। কৃষ্ণাবতারের বহুপূর্ব্বে ত্রেতাযুগের তারক-মন্ত্রে কৃষ্ণনাম পরিদৃষ্ট হয়। দারুরূপী মূর্ত্তিত্রয়! পূর্ণব্রহ্ম, কৃষ্ণ পূর্ণাবতার; সেইজন্য কৃষ্ণাবতারের পর দারুত্রয়ের নাম কৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রা হইয়া থাকিবে।

জগন্নাথদেবের প্রকাশ সম্বন্ধে নারদ পুরাণ, ব্রহ্ম পুরাণ, ও স্কন্দপুরাণান্তর্গত উৎকল খণ্ড মধ্যে যে বিবরণ লিখিত আছে তাহাদের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে পার্থক্য পরিলক্ষিত লইলেও মূলতঃ তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোন অনৈক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। নারদ ও ব্রহ্মপুরাণে বিশ্বাবসু সম্বন্ধে ও ইন্দ্রদ্যুম্নের ব্রহ্মলোক গমন ব্যাপারের কোনও উল্লেখ নাই। উক্ত পুরাণদ্বয়ের মতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কেবল বেদীমাত্র দর্শন করিয়াছিলেন, কারণ দেবমূর্ত্তি যমরাজের প্রার্থনায় বল্লীমধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিরাজমান ছিলেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে, পাণ্ডবগণ এখানে আগমন করিয়া এই মহাবেদী দর্শন করিয়া তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন।

পৌরাণিক বিবরণের উপর নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সাধারণের মনোতুষ্টি সম্পাদনের উদ্দেশে শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে উৎকল দেশে যে গল্প প্রচলিত আছে এবং যাহা অবলম্বন করিয়া উৎকল ভাষায় উৎকলীয় কবি মাগুনিয়া দাস ও শিশুরাম কৃত ক্ষেত্রপুরাণ ও দারুব্রহ্ম রচিত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

সত্যযুগে উজ্জয়িনী বা মালবদেশের অধিপতি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদের নিকট নীলাচল পর্ব্বতের কোনও স্থানে ভগবান স্বয়ং বিরাজমান আছেন অবগত হইয়া বিদ্যাপতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে অনুসন্ধানার্থ তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি নীলাচলে উপস্থিত হইয়া বসু নামক শবরের আবাসে উপস্থিত হইলেন, ঐ নিষাদের ললিতা নাম্নী একটী সুন্দরী অবিবাহিতা যুবতী দুহিতা ছিল। এতদিন উপযুক্ত পাত্রাভাবে বসু তাহার বিবাহ দিতে

সমর্থ হন নাই। সহসা বিদ্যাপতিকে আপন আবাসে উপস্থিত দেখিয়া তিনি ললিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার মনস্থ করিলেন। বিদ্যাপতি প্রথমে শবর-দুহিতার পাণিগ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু বসু নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া অবশেষে তাঁহাকে প্রস্তাবিত বিবাহ ব্যাপারে বাধ্য করিয়াছিলেন। বিবাহ সমাপনান্তে বিদ্যাপতি শ্বশুর গৃহে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি দেখিতে পাইতেন বসু প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে নিজ আবাস হইতে কোথায় চলিয়া যান এবং মধ্যাহ্নকালে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি তৎস্বন্ধে কোন রহস্যই অবগত হইতে পারিলেন না। বসু প্রত্যহ পর্ব্বতোপরি বিরাজিত জগন্নাথ নীলমাধবকে পূজা করিতে যান। যে উদ্দেশে তিনি প্রবাসী হইয়া আছেন তাহা সফল হইবে মনে করিয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। মধ্যাহ্নে বসু গৃহে প্রত্যাগমন করিলে বিদ্যাপতি নীলাচলে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু বসু তাহাতে সম্মত হইলেন না, অবশেষে প্রিয়তমা কন্যা ললিতার নির্ব্বন্ধানুরোধে তাঁহাকে তথায় লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন কিন্তু পাছে পথ পরিচয়ে জামাতা স্বয়ং জগন্নাথ দর্শনে গমন করিতে পারেন, এই ভয় করিয়া তাঁহার চক্ষু বস্ত্র-দ্বারা আবদ্ধ করিয়া লইয়া চলিলেন। বুদ্ধিমতী ললিতা গোপনে স্বামী হস্তে কতকগুলি তিল দিয়া (কাহারও মতে সর্ষপ) পিতার অগোচরে ইহা তাঁহাকে ছড়াইয়া ছড়াইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন এবং আরও বলিয়াছিলেন এই তিল হইতে গাছ জন্মিলে পরে তিনি স্বয়ং ঐ গাছ দেখিয়া রাস্তা চিনিয়া জগন্নাথ দর্শনে যাইতে পারিবেন। বসু জগন্নাথদেবের নীলমাধব মূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিদ্যাপতির চক্ষুর আবরণ উন্মোচন করিয়া দিলেন। অনন্তর বিদ্যাপতি নীল প্রস্তরময় মনোজ্ঞ নীলমাধব মূর্ত্তি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া নিজ জন্ম সার্থক মনে করিলেন। বৃদ্ধ নিষাদ পুষ্প আনয়নার্থ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলে, বিদ্যাপতি দেখিলেন একটী ভূষণ্ডী বায়স বৃক্ষ শাখা হইতে নিকটস্থ কুণ্ডে পতিত হইয়া বিষ্ণুলোক গমন করিল। এই কুণ্ডে স্নান করিলে তিনিও পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক গমন করিতে পারিবেন মনে করিয়া বিদ্যাপতি কুণ্ডাভিমুখে অগ্রসর হইলে এই আকাশবাণী হইল যে (কাহারও মতে সেই ভূষণ্ডী কাকই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বলিলেন) "এই কুণ্ডের নাম রোহিণকুণ্ড, ইহাতে

স্নান করিলে মোক্ষলাভ করিবে, কিন্তু তুমি যাঁহার কার্য্যে আগমন করিয়াছ তাঁহাকে যাইয়া সংবাদ প্রদান কর, নতুবা নরলোকে জগন্নাথদেবের প্রকাশ সম্ভবপর হইবে না।" এই সময় পূজার উপযোগী পুষ্পাদি আহরণ করিয়া বসু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নীলমাধবের পূজা সমাপন করিয়া জামাতার চক্ষু পূর্ব্ববৎ বস্ত্রাবৃত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

তিল হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে বিদ্যাপতি তদবলম্বনে প্রাপ্ত-পথ পরিচয় অবস্থায় একাকী নীলমাধবকে পূজা করিয়া আসিতেন এবং সেই স্থানটী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিলেন। কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত করিয়া স্ত্রী ও শ্বশুরের সম্মতিক্রমে তিনি মালবদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে শ্রীমূর্ত্তি সম্বলিত তথ্য বিজ্ঞাপিত করিলেন। বৈষ্ণব প্রধান ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধব দর্শনার্থে বিদ্যাপতি সমভিব্যাহারে নীলাচল যাত্রা করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইলেন না। সম্ভবতঃ বসু শবর দেবতাকে স্থানান্তরিত করিয়াছে মনে করিয়া রাজা তাহাকে ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। সেই সময় আকাশ বাণী হইল যে ভক্ত শবরের ইহাতে কোনও দোষ নাই, তুমি আর আমাকে নীলমাধব মূর্ত্তিতে দর্শন করিতে পাইবে না, আমি অতঃপর জগন্নাথ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইব, তুমি মন্দির নির্ম্মান করাইয়া ব্রহ্মা দ্বারা আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

রাজা বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করাইলেন; পরে দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মাকে আনয়নার্থ ত্রিদিবে গমন করিলেন। ব্রহ্মা তখন তপস্যায় সমাহিত ছিলেন; অনন্তর তাঁহার তপস্যা ভঙ্গে রাজা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মর্ত্তলোকে আগমন করিলেন।

ইত্যবসরে মন্দির বালুকা রাশির মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়। কিয়ৎকাল পরে গল নামক রাজা মৃগয়া করিতে আসিলে তাঁহার অশ্বের অঙ্গ প্রোথিত মন্দিরের শিখরস্থিত চক্রে সহসা প্রতিহত হয়। কৌতূহল বশবর্ত্তী হইয়া রাজা সেই অসীম বালুকারাশি অপসারিত করাইলে, পুনরায় মন্দির উদ্ধার কার্য্য সম্পন্ন হইল, কিন্তু মন্দির মধ্যে কোনও বিগ্রহ মূর্ত্তির অস্তিত্ব নাই বুঝিয়া তিনি তথায় মাধব মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মন্দিরের অধিকার উপলক্ষে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের ও গল রাজার মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা তখন ভুষণ্ডি কাকও যে সকল * কূর্ম্ম মন্দির নির্ম্মাণোদ্দেশে প্রস্তররাজি বহন ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছিল তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। তাহারা ইন্দ্রদ্যুম্নের অনুকূলেই সাক্ষ্য প্রদান করিলে ব্রহ্মা প্রস্তাবিত মন্দিরে ইন্দ্রদ্যুম্নের অধিকারই নির্ণয় করিলেন।

সেই রাত্রেই রাজার উপর জগন্নাথদেবের এই প্রত্যাদেশ হইল যে কল্য সমুদ্রের তীরে আমার দারুমূর্ত্তির প্রকট হইবে তাহা আমার একান্ত ভক্ত বসু ভিন্ন অপর কেহ তুলিতে সমর্থ হইবে না, বসু দ্বারা সেই দারুখণ্ড আনাইয়া সুনিপুণ সূত্রধর দ্বারা তাহাতে আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া মন্দির মধ্যে উহার প্রতিষ্ঠা করিও।

পরদিন রাজা সেই প্রস্তাবিত দারুখণ্ড আনাইলেন কিন্তু কোনও সূত্রধরই তাহার উপর অস্ত্রের রেখা পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিতে পারিল না। অবশেষে ভগবান স্বয়ং বৃদ্ধ সূত্রধরের বেশে তথায় আগমন করিয়া দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে চাহিলেন, এবং প্রকাশ করিলেন যে আমাকে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত মন্দির অভ্যন্তরে রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিবেন, এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনেরমধ্যে যেন কেহ দ্বার উদ্ঘাটন না করে, করিলে উদ্ঘাটন সময় পর্য্যন্ত মূর্ত্তিগুলির যতদূর নির্ম্মাণ কার্য্য হইয়া থাকিবে সেই অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই তাহা থাকিয়া যাইবে। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া মন্দির মধ্যে বৃদ্ধকে আবদ্ধ রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মন্দিরের বহির্দ্দেশ হইতে অভ্যন্তর ভাগের কোনও রূপ শব্দ কর্ণগোচর না হওয়ায় বৃদ্ধ হয়ত জীবিত নাই মনে করিয়া রাজা মনে মনে একান্ত সন্দিহান হইয়া উঠিলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া অসহিষ্ণুতা বশে সহসা মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন সূত্রধর সেখানে নাই এবং মূর্ত্তিগুলির নির্ম্মাণ কার্য্য তখন ও পর্য্যন্ত অসমাপ্ত; জগন্নাথ ও বলরামের হস্তগুলি যেন মস্তক হইতে

---

* "কূর্ম্ম মানঙ্ক পিঠরে।
আনন্তি বহাই পাথরে॥"
মাগুনিয়া দাস।

নির্গত এবং তাঁহাদের হস্তের গঠন পত্তনমাত্র হইয়াছে, সুভদ্রাদেবীর তাহাও হয় নাই।

"দেখিলে সিংহাসনো পরে।
বিজয়ে বউদ্ধ রূপরে॥
পদ অঙ্গুলি নাহি হাত।
শ্রীদারু ব্রহ্ম জগন্নাথ॥"

(দারুব্রহ্ম, ৫অ, ৩২।৩৩ শ্লোক।)

কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রধানা মহিষী গুণ্ডিচাদেবী বন্ধ্যাদশা হইতে মুক্ত হইবার আশায় জগন্নাথদেবের মুখারবিন্দ সন্দর্শন জন্য একান্ত আকুল ও উৎসুক হওয়ায় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পত্নীর ঐকান্তিক আগ্রহাতিশয়ে নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অসহিষ্ণুতাবশে মন্দিরের দ্বার সহসা উদ্‌ঘাটিত করেন, সেই জন্যই মূর্ত্তিত্রয় ঐরূপ অসম্পূর্ণ রাখিয়া সূত্রধরবেশী নারায়ণ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। অনন্তর গভীর রজনীযোগে জগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া বলিয়াছিলেন।

"মুই বউদ্ধ রূপ হই
কলি যুগরে থিবু রহি।
সুবর্ণ হস্ত গোড় করি
গড়াহি দেব দণ্ড ধারি॥"

(মাগুনিয়া দাস।)

কলিযুগে আমি হস্ত পদ বিহীন বুদ্ধরূপে এখানে অবস্থান করিব, তুমি সুবর্ণদ্বারা আমার হস্ত পদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিও।

অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি।

রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন কত বাধা, কত বিপত্তি অতিক্রম করিয়া মালবদেশ হইতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন করিয়া অভ্রভেদী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মাকে আনয়ন করিবার জন্য ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাঁহার যুগব্যাপী তপস্যাকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, তাঁহাকে ব্রহ্মলোক হইতে মর্ত্তলোকে আনয়ন করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নীর একান্ত আগ্রহাতিশয্য বশতঃই হউক বা অন্য কোন

কারণেই হউক, সামান্য একবিংশতি দিবসের বিলম্ব সহ্য করিতে অসহিষ্ণু হইয়া তিনি যে মন্দিরের দ্বার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই উদ্ঘাটন করাইয়া মূর্ত্তিত্রয় অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিবার কলঙ্ক ভাজন হইয়াছিলেন, দেবকল্প রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সম্বন্ধে এইরূপ অসার ও যুক্তিহীন ভাব মনে পোষণ করিলে তাঁহার গৌরবের লাঘব করা হয় মাত্র।

পুরাণাদিতে জগন্নাথদেবের ঐরূপ অসম্পূর্ণ মূর্ত্তির কোন উল্লেখ নাই বরং স্পষ্টই লিখিত আছে জগন্নাথদেবের হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম চিহ্ন বিরাজিত, বলদেব গদা, মূষল, চক্র, ও বজ্রচিহ্ন ধারণ করিয়া আছেন, এবং লক্ষ্মীদেবীর এক হস্তে বরপদ্ম ও অপর হস্তে অভয় বিরাজিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত এইরূপ সম্পূর্ণমূর্ত্তিই বিরাজমান ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিশ্বকোষ নামক প্রামাণ্যকোষ গ্রন্থের সম্পাদক বলেন যে, চৈতন্যদেব জগন্নাথদেবের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরে রচিত উৎকল তীর্থসমূহের বিবরণপূর্ণ কপিল সংহিতা নামক গ্রন্থেও শ্রীমূর্ত্তির চতুর্ভুজ মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী যবন হস্তে কলুষিত হইয়াছিল। হিন্দুকুলকলঙ্ক কালা পাহাড় ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে জগন্নাথদেবের আদি মূর্ত্তি দগ্ধ করিয়াছিল। মাদলা পাঁজির মতানুসারে রামচন্দ্র দেবের সময় জগন্নাথদেবের নব কলেবর সংঘটিত হয়। অনুমান হয় যে কালাপাহাড়দগ্ধ সেই মূর্ত্তির অনুকরণ মতেই নব কলেবর গঠিত হইয়া থাকিবে। জগন্নাথদেবের বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি যে ঐ কারণ সম্ভূত তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে মনে হয় যেন বিশ্বসংসারের একমাত্র অধীশ্বর জগন্নাথদেব, তাঁহার নিজ ইচ্ছা অনুসারে জগৎ কার্য্য পরিচালিত হয়, সুতরাং তাঁহার নিজের হস্তপদাদির প্রয়োজন নাই বলিয়া তাঁহার সন্তান আমাদিগকে হস্ত পদাদি যোগে সংসারের নিখিল কার্য্য সাধন করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে নিজে হস্ত পদ বিহীন হইয়া চন্দ্র সূর্য্যোপম দুটি বৃহৎ চক্ষু সহযোগে সংসারের অধীশ্বর স্বরূপ আমাদের কৃতকার্য্য সমূহ নিজেই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কোন্ কার্য্যটী ভাল আর কোন্‌টাই বা মন্দ তাহার বিচার করিতেছেন। পূজ্যপাদ মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলেন অথর্ব্ববেদে দারু

মূর্ত্তির উল্লেখ আছে ; ওঁকার ব্রহ্ম ; ভাষ্য কর্ত্তারা উহা অকার উকার ও মকার যোগ দ্বারা যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। বেদে ওঁকার মূল মন্ত্রকে দেবতারূপে আবাহন করা হইয়াছে। জগন্নাথদেব ওঁকার মূর্ত্তি। ওঁকার মূর্ত্তি নিরাকার ব্রহ্মের পূর্ণ বিরাট মূর্ত্তির পরিচায়ক কর চরণ বিহীন হইয়াছেন। ওঁকার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ত্রিমূর্ত্তি সংগঠিত হইয়াছে। উক্ত ওঁকারকে হিন্দুরা যন্ত্ররূপে নির্ম্মাণ করিয়া অর্চ্চনা করেন। নীলাদ্রি মহোদয় গ্রন্থান্তর্গত প্রতিমা নির্ম্মাণ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে জগন্নাথদেবের প্রতিমা চক্র যন্ত্রে, বলদেবের শঙ্খ যন্ত্রে সুভদ্রাদেবীর পদ্মযন্ত্রে ও সুদর্শন চক্র গদা যন্ত্রে গঠিত। জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি ভাস্কর বিদ্যার অতি শৈশববস্থায় নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া মূর্ত্তি এরূপ অসম্পূর্ণ হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন পীঠ সকলে শিল্পবিদ্যার শৈশবাবস্থার পরিচায়ক কর-চরণ বিহীন অনেক দারুময় ও প্রস্তরময় মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে যে ভাস্কর বিদ্যার অতি শৈশব সময়েই জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তি আলিখিত হইয়াছিলেন এবং সেই আদিম মূর্ত্তিই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিরাজমান আছেন। জগন্নাথ মূর্ত্তি যে অতি প্রাচীন কালের মূর্ত্তি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। উক্ত মন্দির-গাত্রে কিন্তু অসংখ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহার নিজমূর্ত্তি যে কি কারণে অসম্পূর্ণ ও অপূর্ব্ব তাহার নিশ্চয়ই কোনও নিগূঢ় কারণ আছে। যাহা হউক শ্রীমূর্ত্তি যেরূপই হউন না কেন, ভক্তের প্রাণ সুদূর দেশ দেশান্তর হইতে নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেই বিশ্ব বিমোহন মুখারবিন্দ সন্দর্শন জন্য ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে আগমন করেন, এবং ওঁকাররূপী দারুমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তকুল মনে মনে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া নিজ নিজ জীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সেই আনন্দ ও সেই প্রেম যে কি অনির্ব্বচনীয় দুর্লভ সামগ্রী তাহা ভক্তের প্রাণই অনুভব করিতে সমর্থ, অন্যে নহে!

বৌদ্ধধর্ম্মের দাবী।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হণ্টার সাহেব এবং বঙ্গ-সুধীকুল-গৌরব ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মহোদয়গণ জগন্নাথ সুভদ্রা ও

বলরামের মূর্ত্তিত্রয়কে বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মসঙ্ঘের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও শঙ্ঘের * রূপান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মত অবলম্বন করিয়া উড়িষ্যা নিবাসী ৺প্যারিমোহন আচার্য্য তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন :—

"বৌদ্ধঙ্ক মালমসলারু যে জগন্নাথ দেবঙ্কর সৃষ্টি হই অছি এথিরে কোনসি সন্দেহ নাহি।"

কিন্তু দারুব্রহ্মের মূর্ত্তিত্রয় এবং বৌদ্ধ যন্ত্র দেখিবা মাত্রই বুঝা যায় যে উভয়ের মধ্যে আকৃতি-গত সামান্য সাদৃশ্য মাত্রও নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারের বহু পূর্ব্বে যে অথর্ব্ব বেদ রচিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারেনা। উক্ত বেদে দারুমূর্ত্তি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। জগন্নাথদেবের রথযাত্রাকে বুদ্ধদেবের দন্তোৎসবের অনুকরণ বলিয়া উল্লিখিত হয় কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের, বহু পূর্ব্বে স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের দেশে রথযাত্রা প্রচলিত আছে, ইহার প্রমান আবশ্যক নাই।

অক্ষয় বটকেও বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। মহাভারতে অক্ষয় বটের উল্লেখ আছে এবং গয়া ও প্রয়াগ ক্ষেত্রেও অক্ষয়বট বর্ত্তমান আছে। কেবল পুরীর অক্ষয় বটটীকেই বোধিবৃক্ষের নিদর্শন বলা সমীচীন নহে।

পুরীধামে মহাপ্রসাদ যে জাতিও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সেবিত হইয়া থাকে ইহা হইতে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে পূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। ইহা অবশ্য অসম্ভব না হইতে পারে যে পূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহার পরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের প্রভাবেই এখানে জাতীয়তাভাবে মূলতঃ শিথিলতা ঘটিয়া থাকিবে। অশোক প্রভৃতি যে যে বৌদ্ধ চক্রবর্ত্তীর অভ্যুদয় হইয়াছিল তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে বৌদ্ধমতে জগন্নাথদেবের অর্চ্চনাদির ব্যাপার মাদলা পঞ্জিকাতে সম্পূর্ণরূপে লিখিত আছে ; দেবতার পূজাদি কিয়ৎকাল ব্যাপিয়া বৌদ্ধমতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পুরীর শ্রীমন্দির কখনই বৌদ্ধমতে প্রতিষ্ঠিত নহে। মহাপ্রসাদের সেবন ব্যাপারে

---

* It is the name of the third member of the Budhist triad and represents actual creative power, or an active creator or ruler, deriving his origin from the union of the essence of Budhda and Dharma." Lalita-Bistar P. 17.

জাতিবর্ণ বিচার নাই। কেবল শ্রীমন্দিরে প্রবেশ বিষয়ে অনধিকারী কতকগুলি অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য জাতি ভিন্ন আর সকলেরই স্পৃষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণআদি সকল জাতিই অবাধে গ্রহণ করিতে পারেন। ভুবনেশ্বরেও এই রীতি প্রচলিত আছে। গঙ্গাজল নীচজাতি দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও তাহার পবিত্রতার বিদ্যমানতা পক্ষে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। দেবাদি দেব জগন্নাথদেবের প্রসাদও সেইরূপ স্বতঃই পবিত্র বিধায় অপরের স্পর্শ দোষ দৃষ্ট হয় না। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবেই যে এরূপ হইয়াছে ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। জগন্নাথদেব আপামর সাধারণের দেবতা,তাঁহার নিকট সকলই সমান, তাঁহার পবিত্র ক্ষেত্রে তাঁহারই প্রসাদ তাঁহার সৃষ্ট ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল একত্র বসিয়া ভোজন করিয়া পবিত্র হইবে ইহা বিচিত্র নহে!

খৃষ্টীয় দাবী।

এইস্থানে একটি হাস্যোদ্দীপক কাহিনীর উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। একদা কোন কৃতবিদ্য খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন যে আর্য্যগণ মধ্য প্রদেশ হইতে যখন চারিদিকে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন খৃষ্টীয় ওল্ড টেস্টামেণ্ট নামক ধর্ম্ম পুস্তক প্রচারিত ছিল। ওল্ড টেস্টামেণ্ট পুস্তকে যীশু-খৃষ্টের জন্ম ও তাঁহার ক্রুশোপরি মৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী লিখিত ছিল। আর্য্যদিগের যে শাখা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ওল্ড টেস্টামেণ্ট লিখিত ক্রুশের বিবরণ সম্যক অবগত ছিলেন এবং পরে সেই ক্রুশের অনুকরণেই পুরীধামে তাঁহারা জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। উক্ত মতের সমর্থনার্থ তিনি বলেন ভারতের অন্য কোনও দেবতা দারু নির্ম্মিত নহে। কেবল কাষ্ঠ নির্ম্মিত ক্রুশের অনুকরণেই জগন্নাথ মূর্ত্তি কাষ্ঠ নির্ম্মিত এবং তাহা দেখিতেও ক্রুশের ন্যায়। যীশু-খৃষ্টকে ক্রুশে স্থাপিত করিয়া চেলির কাপড় পরাইয়া এবং তাঁহার কপালে লিখিয়া মস্তকে কণ্টক মুকুট পরাইয়া পূর্ব্বে যেরূপ তাঁহাকে গালি বর্ষণ ও বেত্র প্রহার করা হইয়াছিল, জগন্নাথদেবকেও সেইরূপ রথে স্থাপন করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে চেলির কাপড় পরাইয়া তাঁহার কপালে লিখিয়া ও মাথায় কাঁটার মত এক প্রকার মুকুট পরাইয়া এবং কটিদেশ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দেওয়া ও বেত্র প্রহার করা হইয়া থাকে।

শুনা যায় এই বৃদ্ধটী পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বংশাবতংস ছিলেন পরে ভাগ্যচক্রে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এই সকল বালকোচিত কাহিনী বাতুলের প্রলাপ বলিয়া অসার ও অসঙ্গত বোধে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই সঙ্গত। কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকিলেও বড়লোকের সহিত সম্পর্ক স্থাপন প্রয়াস অনেকেরই স্বভাব, হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র বড় তীর্থ বিশেষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস ধর্ম্ম বিশেষের পক্ষে বিচিত্র নহে!

জগন্নাথ মূর্ত্তির প্রতি অত্যাচার।

(১) রাজা শিবদেব বা শোভনদেবের রাজত্ব সময়ে রক্ত বাহু নামে এক-জন যবন পুরী আক্রমণ করেন। সংবাদ পাইয়াই শোভনদেব জগন্নাথ মূর্ত্তি ও রত্নালঙ্কার সকল মধ্য প্রদেশস্থ সম্বলপুরের নিকট শোণপুরস্থ গোপল্লী নামক স্থানে একটী পাষাণময় পাত্রে রাখিয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করেন এবং স্থান নিরূপনার্থ সেই স্থানে একটী বটবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। প্রায় দেড়শত বৎসর পরে মহারাজ যযাতি কেশরী কতকগুলি দৈবচিহ্ন ও অলৌকিক ঘটনা প্রভাবে প্রণোদিত হইয়া জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি ও মন্দির অনুসন্ধান জন্য পুরীতে গমন করেন; তিনি শোনপুর পল্লী খনন করাইয়া দেবমূর্ত্তি উদ্ধার করিয়াছিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নির্ম্মিত মন্দির যবন হস্তে নষ্ট হইয়াছিল। যযাতি কেশরী সেই মন্দিরের অনুরূপ নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। জগন্নাথমূর্ত্তি প্রোথিত অবস্থায় জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় নূতন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি সেই মন্দিরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথের পূর্ব্ব পূজকদিগের উত্তরাধিকারীগণকে রতনপুর হইতে অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া শ্রীমূর্ত্তির পূজার জন্য নিয়োজিত করেন এবং পূজা ও পাঠাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যথেষ্ট পরিমাণ ভূসম্পত্তি উৎসর্গ করেন। এইজন্য যযাতি কেশরী দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত হইয়া আছেন।

(২) প্রতাপরুদ্রের রাজত্ব সময়ে পাঠানেরা কটক লুণ্ঠন করিয়া পুরীর দিকে অগ্রসর হইতেছে শ্রবণ করিয়া পাণ্ডাগণ শ্রীমূর্ত্তি চিল্কাহ্রদের অপর পারস্থ চড়েই গুহা নামে পর্ব্বত কন্দরে গোপন করিয়া রাখেন, পরে প্রতাপ রুদ্রের সহিত পাঠানগণের সন্ধি সংস্থাপিত হইলে তিনি শ্রীমূর্ত্তি আনিয়া পুনরায় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

(৩) নরসিংহদেবের রাজত্ব সময়ে যুবরাজ খুরম (পরে সাহজাহান) যাজপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে, তিনি জগন্নাথদেবকে খুর্দ্দায় স্থানান্তরিত করেন; এবং যুবরাজ স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া শ্রীমূর্ত্তি পুনরায় মন্দিরে লইয়া যান।

(৪) আওরঙ্গজেব কাশীর ও মথুরার দেব মন্দিরের ধ্বংস সাধন করিয়া জগন্নাথের মন্দির ধ্বংশ করিবার উদ্দেশে নবাব ইকরাম খাঁকে আদেশ প্রদান করেন। খুর্দ্দার তদানীন্তন রাজা দ্রব্য সিংহ দেব একটী রাক্ষসমূর্ত্তি, একটী চন্দন মূর্ত্তি ও দুইটী বহুমূল্যবান হীরকখণ্ড বিজাপুরে আওরঙ্গ জেবের নিকট প্রেরণ করিয়া সে যাত্রা কৌশলে দারুমূর্ত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন।

(৫) পুরুষোত্তমদেবের রাজত্ব সময়ে মির্জা খুরম তদীয় রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি জগন্নাথমূর্ত্তি কপিলেশ্বরপুরে স্থানান্তরিত করেন এবং খুরম প্রত্যাগমন করিলে পুনরায় তাহা আনয়ন করিয়াছিলেন।

(৬) বঙ্গাধিপ নবাব সলিমানের সেনানায়ক হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী নৃশংস কালাপাহাড় মন্দিরের ধ্বংশ সাধন করিতে আগমন করিতেছে শ্রবণ করিয়া মন্দির রক্ষক পাণ্ডাগণ শ্রীমূর্ত্তি চিল্কাহ্রদের নিকট পারিকুদ্ নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন, কিন্তু পাষণ্ডপ্রকৃতি কালাপাহাড় উহার সন্ধান অবগত হইয়া সেখান হইতে মূর্ত্তি আনাইয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া দগ্ধ করে। কথিত আছে সেই নৃশংস ব্যাপার সাধন সময়ে কালাপাহাড়ের হস্ত পদাদি খসিয়া যায়, এবং তাহার ফল স্বরূপ চরমে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিসার মহান্তি নামক জনৈক পরম ভক্ত কৌশল ক্রমে জগন্নাথদেবের চিতাবহ্নি হইতে অর্দ্ধদগ্ধ শ্রীমূর্ত্তির উদ্ধার সাধন করিয়া কুজংএর (এক্ষণে বর্দ্ধমান রাজার সম্পত্তি) জনৈক খণ্ডাইতের হস্তে প্রদান করেন। রাজা রামচন্দ্রদেব কুজং হইতে এই দগ্ধাবশেষ মূর্ত্তির উদ্ধার সাধন করিয়া নিম্বকাষ্ঠে নূতন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার পুনরাভিষেক কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

উড়িষ্যার নায়েব নাজিম (নায়েব সুবাদার) সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁর উত্তরাধিকারী মহম্মদ তকিখাঁ জগন্নাথ মন্দিরের তত্ত্বাবধানে হস্তার্পণ করিবেন শ্রবণ করিয়া খুর্দ্দার রাজা জগন্নাথদেবকে চিল্কাপারস্থ একটী পাহাড়ের উপর

স্থানান্তরিত করেন এবং নবাব মুরসিদ কুলীখাঁর শাসন সময়ে তাঁহাকে নজর দানে সন্তুষ্ট করিয়া জগন্নাথদেবকে পুরীতে পুনরায় আনয়ন করেন।

কালাপাহাড়।

দার্জ্জিলিং ডাকগাড়ীর মোকর্দ্দমায় অভিযুক্ত সুবিখ্যাত দুর্গাচরণ স্যানাল মহাশয়ের "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" নামক পুস্তকে কালাপাহাড় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :—

উঁহার প্রকৃত নামক কালাচাঁদ রায়, পিতা নয়ন চাঁদ রায়, নিবাস বীর জাওন গ্রাম জেলা রাজসাহী ; অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি মাতামহ গৃহে লালিত পালিত হন। কালাচাঁদ অতিশয় বুদ্ধিমান, বলবান এবং সুন্দর পুরুষ ছিলেন, এবং মাতামহের নিকট বাঙ্গালা, পারসী ও সংস্কৃত শিখিয়া ছিলেন। তিনি শ্রীপুর গ্রাম নিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে তিনি বাদসাহ সলিমান কেরাণীর অনুগ্রহে গৌড় নগরের ফৌজদার নিযুক্ত হন। বাদসাহের পরমা সুন্দরী কন্যা দুলারী বিবি অট্টালিকার ছাদ হইতে কালাচাঁদকে দেখিয়াই মনে মনে তাঁহাকে আত্মসমর্পন করেন। বাদসাহ কালাচাঁদের নিকট কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু প্রথমতঃ নানা প্রকার প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন করিয়াও যখন সম্মত করিতে পারিলেন না তখন তাঁহাকে শূলে দিবার আদেশ প্রদান করিলেন। ঘাতকগণ কালাচাঁদকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়াছে শ্রবণ করিয়া দুলারী বিবি উন্মত্তার ন্যায় সেখানে উপস্থিত হইয়া কালাচাঁদকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং ঘাতকগণকে বলিলেন, অগ্রে আমাকে হত্যা সাধন কর, পরে ইঁহাকে নিহত করিতে পারিবে। নবাবের নিকট সংবাদ পৌছিলে তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে কালাচাঁদ নবাব কন্যার অপূর্ব্ব প্রেম ও সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। বিবাহ ব্যাপারও সেইদিনেই যথাবিধি সম্পন্ন হইল। কালাচাঁদ সমাজচ্যুত হইলেন বটে কিন্তু মাতার ঐকান্তিক অনুরোধে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেও হিন্দুসমাজ তাঁহাকে প্রত্যাখান করিল। অনন্তর তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়া দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্য যথাবিধি 'ধন্যা' দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও জগন্নাথদেবের কোনও প্রত্যাদেশ না হওয়ায় এবং পক্ষান্তরে পাণ্ডাগণ তাঁহার পরিচয়

প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে মন্দির হইতে নিষ্কাসিত করিয়া দেওয়ায়, লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত কালাচাঁদ ক্রোধে অন্ধ হইয়া মহম্মদ কার্ম্মুলি নাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং হিন্দুধর্ম্ম লোপ এবং দেবদেবী মূর্ত্তির নিপাত সাধন করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্বশুরের সমস্ত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তদানীন্তন উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তিনি উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। কালাপাহাড় জগন্নাথ বিগ্রহ দগ্ধ করিয়া বহু পাণ্ডাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

গৌড়, রাঢ়, মিথিলা, কামরূপ, আসাম, রঙ্গপুর, কাশী, গয়া, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানের দেবমূর্ত্তি সকল ধ্বংশ করিয়া কালাপাহাড় লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

কাশীধামে অত্যাচার সময়ে জনৈক মুসলমান একটী স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার করিয়াছিল। সেই স্ত্রীলোকটী কালাপাহাড়ের মাতুলানি, এবং তিনি যে কাশীধামে ছিলেন কালাপাহাড় তাহা অবগত ছিলেন না। তিনি রোদন করিতে করিতে কালাপাহাড়ের নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে বহু তিরস্কার করিয়া পরিশেষে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। কালাপাহাড় উক্ত ঘটনায় সহসা স্তম্ভিত হইয়া তৎক্ষণাৎ অত্যাচার করিতে নিরস্ত হইলেন। কাশীধামে কেদারেশ্বর লিঙ্গই একমাত্র অনাদি লিঙ্গ। উহা ব্যতীত আর সমস্ত লিঙ্গই কালাপাহাড়ের পরে প্রতিষ্ঠিত। উক্ত ঘটনার রাত্রেই কালাপাহাড় সহসা নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যান। কেহ বলেন তিনি মনের অনুতাপে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, কেহ বলেন তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিয়া ছিলেন। আবার কেহ বলেন, তিনি মহাদেবের অংশ ছিলেন এবং বিশ্বেশ্বরে লীন হইয়া অনন্তধামে প্রস্থিত হন।

উড়িষ্যার সামান্য সামান্য গ্রামস্থ দেবদেবী মূর্ত্তি গুলির মধ্যে কোনটীর হাত কোনটীর পা, কোনটীর বা মুখ ভগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসা করিলেই সেবকগণ বলেন যে কালাপাহাড় কর্ত্তৃকই ঐরূপ হইয়াছে। কালাপাহাড় যে সর্ব্বত্র গমন করিয়া দেবদেবী মূর্ত্তি ধ্বংশ করিয়াছিলেন তাহা সম্ভবপর নহে। সম্ভবতঃ অন্যান্য বিধর্ম্মী এবং দুর্ব্বৃত্তগণ কালাপাহাড়ের উড়িষ্যা আক্রমণ সময়ে সুবিধা বুঝিয়া যে যেখানে পারিয়াছিল সেই সেখানকার দেবদেবী ধ্বংশ করিয়া

রত্ন অলঙ্কার আদি লুণ্ঠন করিয়া থাকিবে। কটক জেলার মাহাঙ্গা থানায় শুক্লেশ্বর গ্রামে মানিকেশ্বর লিঙ্গের অত্যুচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির ও সম্মুখস্থ মন্দিরের দুর্গা দেবীর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি এই সকল হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষীগণের হস্তে নষ্ট হইয়াছিল। কালাপাহাড় উড়িষ্যায় যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন আর কোথায়ও সেরূপ করেন নাই। নিম্নলিখিত গ্রাম্য কবিতা পাঠে বুঝিতে পারা যাইবে কালাপাহাড়ের অমানুষিক অত্যাচার ও নৃশংস কাহিনী উড়িষ্যাবাসী আজও বিস্মৃত হইতে পারে নাই :—

"আইলা কলাপাহাড়।
ভাঙ্গিলা লৌহার বাড়॥
খাইলা মহানদী পানি।
স্বর্ণ থালিরে হেড়া, পশস্তি মুকুন্দঙ্ক বাণী॥"

শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের মন্দির।

মন্দির নির্ম্মাণ।

বর্ত্তমান মন্দির রাজা অনিয়ঙ্ক ভীমদেব ১১১৯ শকাব্দে পরমহংস বাজপেয়ীর তত্ত্বাবধানে প্রায় ৩ কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মা দ্বারা যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন, যবনগণ কর্ত্তৃক তাহা নষ্ট হইলে, রাজা যযাতি কেশরী পুরাতন মন্দিরের অনুরূপ আর একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বর্ত্তমান মন্দির যে ১১১৯ শকাব্দে অনিয়ঙ্ক ভীমদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে মন্দির গাত্রে একটী শিলালিপির বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়। বহু পরিবর্ত্তনের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করার পর মন্দির বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। যে স্থানে মন্দির সংস্থাপিত, তাহা নীলগিরি বা নীলাচল বলিয়া অভিহিত। নীলমাধব মূর্ত্তি বিরাজমান থাকায় এই স্থানের নাম নীলাদ্রি হইয়াছে। মন্দিরটী বড়দাণ্ড নামক ষষ্টিহস্ত পরিমিত সুপ্রশস্ত রাজ পথের উপর অবস্থিত। এই পথেই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হয় এবং উহা গুণ্ডিচাবাটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ভুবনেশ্বরের মন্দির বুদ্ধগয়ার মন্দির অপেক্ষা উচ্চ কিন্তু পুরীর মন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা অনেক উচ্চ। গয়ার বিষ্ণুপাদ পদ্মের মন্দির নয়ন প্রীতিকর, কিন্তু জগন্নাথদেবের মন্দির তাহা অপেক্ষাও সুন্দর।

অরুণস্তম্ভ।

মন্দিরের সম্মুখেই বড় দাঁড়ের উপর একটী অষ্টবিংশহস্ত পরিমিত কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ আছে। পূর্ব্বের অরুণ স্তম্ভটী বিধর্ম্মী হস্তে বিনষ্ট হইলে মহারাষ্ট্রীয়গণের ব্রহ্মচারি গুরু কোণার্কের মন্দিরের অরুণ স্তম্ভটী আনয়ন করিয়া এখানে স্থাপিত করেন। এই স্তম্ভটী মাত্র একখানি প্রস্তরে নির্ম্মিত। এবম্বিধ বিশাল স্তম্ভ মাত্র একখানি প্রস্তরে নির্ম্মিত, ইহা ভাস্কর বিদ্যার পূর্ণ ও প্রকট নিদর্শন নহে কি? বর্ত্তমান বিজ্ঞান উহার গ্রোথন রহস্য নির্ণয় করিতে পারে নাই, সেইজন্যই কেহ কেহ বলেন উহা খণ্ড খণ্ড প্রস্তরে গঠিত হইয়াছে। তদানীন্তন কালের গঠন উপাদান এরূপ ছিল যে দেখিলেই মনে হয় যেন একখানা প্রস্তর উর্দ্ধশির অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। কথিত আছে যে অরুণস্তম্ভ যত উচ্চ, জগন্নাথদেব যে বেদীর উপর বিরাজিত আছেন সেই রত্ন বেদিটীও উচ্চতায় তদনুরূপ।

মন্দিরের চত্বর।

অরুণস্তম্ভ অতিক্রম করিয়াই মন্দিরের প্রাচীর ও পূর্ব্বদিকের প্রবেশ দ্বার। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ৪৫০ হাত দীর্ঘ ও ৪৫০ হস্ত প্রস্থ এবং ১৬ হাত উচ্চ "মুগনি" পাথরে নির্ম্মিত একটি প্রাচীর আছে, তাহার নাম মেঘনাদ ও ইহার ভিতরে আরও একটি প্রাচীর আছে। মন্দিরের প্রাচীরের চারিটি দ্বার। পূর্ব্বদিকে, অরুণ স্তম্ভের দিকে বড় দাঁড়ের উপর যে দ্বার তাহার নাম সিংহ দ্বার। উত্তরদিকের দ্বারে দুইটি হস্তী আছে বলিয়া তাহার নাম হস্তী-দ্বার, দক্ষিণদিকের দ্বারে দুইটি অশ্ব আছে বলিয়া তাহার নাম অশ্বদ্বার এবং পশ্চিম দিকের দ্বারকে খঞ্জদ্বার বলে। এই দ্বারে কোনও মূর্ত্তি নাই। সিংহদ্বারের দুই পার্শ্বে জয় ও বিজয়ের দুইটি মূর্ত্তি আছে।

বাহিরের প্রাচীর ও ভিতরের প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে বহিঃপ্রাঙ্গন ও ভিতরের প্রাচীর বেষ্টিত স্থানকে অন্তঃপ্রাঙ্গন বলা হয়।

বহিঃপ্রাঙ্গন।

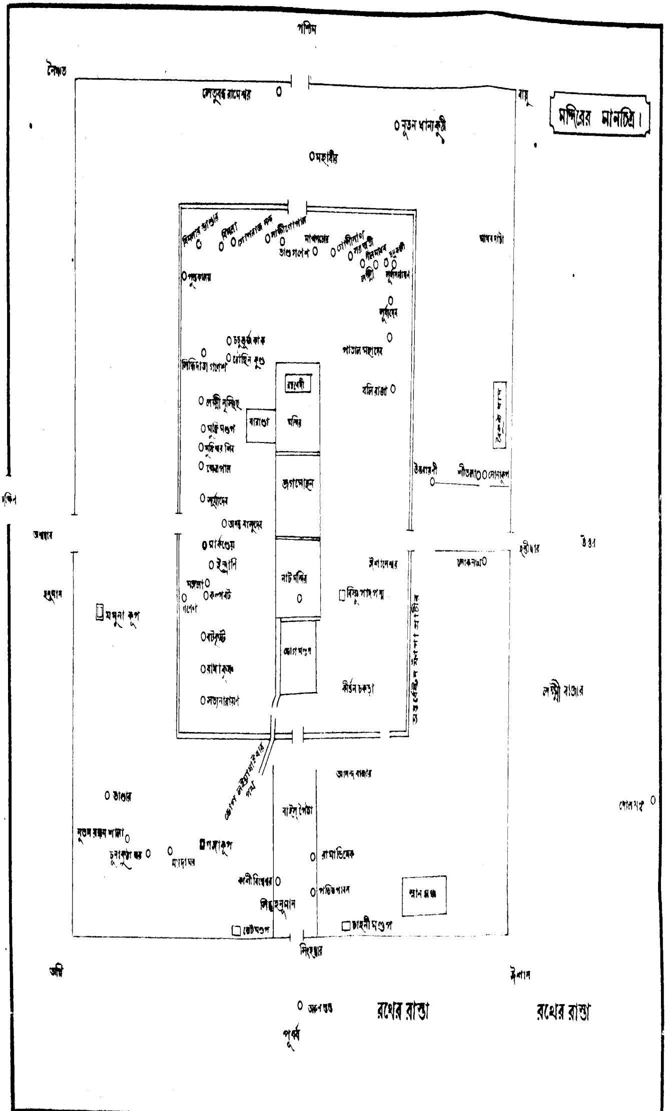
কপিলেন্দ্র দেব মন্দিরের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে মন্দিরের বহির্বেষ্টন নির্ম্মিত হয়। সিংহদ্বার মন্দিরের প্রধান দ্বার, এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত পাবন নামক জগন্নাথ মূর্ত্তি। যে সকল নীচ জাতির পক্ষে মন্দির প্রবেশ নিষেধ আছে তাহারা এই জগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শন করে। ইহার পরেই দ্বাবিংশ সংখ্যক সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া অভ্যান্তরস্থ তোরণে উপনীত হইতে হয়। এই সিঁড়ীকে "বাইস পৈঁঠা" বলে। উহা যেখানে আরম্ভ হইয়াছে তাহার বামদিকে ৺কাশীধামের বিশ্বেশ্বর বিরাজমান আছেন এবং সোপানের উভয় পার্শ্বে জগন্নাথদেবের ভোগ, লাড্ডু, দন্তভাঙ্গা মিঠাই প্রভৃতির আপণ শ্রেণী। ভিতরের প্রাচীরের তোরণে প্রবেশ না করিয়া দক্ষিণদিকে উত্তরমুখে গমন করিলে সম্মুখেই আনন্দ বাজার। ইহাকে "স্বর্ঘর" ও বলা হয়। এখানে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ বিক্রয় হইয়া থাকে। তাহার পর চাহনি মণ্ডপ ও স্নানমঞ্চ (বা স্নান পীড়ি)। স্নানমঞ্চে স্নান যাত্রার সময় জগন্নাথদেবকে স্নান করান হয় এবং চাহনি মণ্ডপ হইতে লক্ষ্মীদেবী তাহা দর্শন করেন। স্নানমঞ্চ রাজপথ হইতে উত্তমরূপ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উত্তরদিকে হস্তীদ্বারের উভয় পার্শ্বে ঈশানেশ্বর লোকনাথ ও শীতলাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান। শীতলা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে সোনাকূপ নামক কূপ আছে। এই কূপ সর্ব্বদাই বন্ধ করিয়া রাখা হয়, কেবল স্নান যাত্রার সময় ইহা উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। সোণার কলসে ১০৮ কলস জল লইয়া জগন্নাথদেবকে স্নান করাইতে হয়। হস্তীদ্বারের পশ্চিমদিকে একটী দ্বিতল গৃহ আছে তাহার নাম বৈকুণ্ঠপুরী। স্নান যাত্রার পর প্রতিবৎসর এস্থানে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়া থাকে, এবং উহার পশ্চিমদিকস্থ চত্বরে প্রতি দ্বাদশ বর্ষান্তে জগন্নাথদেবের নূতন কলেবর নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার ভিতর দুইটী বেদী আছে তাহার একটীতে পুরাতন মূর্ত্তি ও অপরটীতে নূতন মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। বৈকুণ্ঠপুরীতে আটিকা বন্ধন হইয়া থাকে। ইহার পশ্চিমে মাধব নাট্ট নামক স্থানে জগন্নাথদেবের পুরাতন কলেবর প্রোথিত করা হয়। পশ্চিমদিকে খঞ্জদ্বারের পার্শ্বে জগন্নাথ-দেবের নূতন ধান্যকুঠী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থানে হনুমান ও সেতুবন্ধ রামেশ্বর

আছেন। দক্ষিণদিকে অশ্বদ্বারের পার্শ্বে হনুমান ও শিবলিঙ্গ প্রভৃতি আছেন, পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ অগ্নিকোণ হইতে "বাইস পৈঁঠার" মধ্যবর্ত্তী স্থানে গঙ্গা যমুনা নামক কূপদ্বয়, ভাণ্ডার ঘর, নূতন রন্ধনশালা, চুনাকুটা ঘর ও ভেট মণ্ডপ আছে। গঙ্গা ও যমুনা কূপের জল রন্ধনে ব্যবহৃত হয়। রন্ধনশালায় এক একটী উননের উপর অনেকগুলি হাঁড়ী সাজাইয়া লক্ষ লক্ষ যাত্রীর রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। চুনাকুটা ঘরে চাউল প্রভৃতি চূর্ণ হয়। এবং ময়দা ঘরে ময়দা পেশাই হয়। ভেট মণ্ডপে রথযাত্রার উৎসব অবসানে লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথদেবের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে থাকেন। রন্ধনশালা হইতে ভিতরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত ভোগ-মন্দিরে ভোগ লইয়া যাইবার জন্য একটী আচ্ছাদন যুক্ত পথ আছে।

অন্তর্প্রাঙ্গন।

পুরুষোত্তম দেবের সময় অন্তর্বেষ্টন বা কুর্ম্মিবেড় অর্থাৎ ভিতরের বেড় সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হয়। "বাইস পৈঁঠার" উপরিভাগেই ভিতরের প্রাচীরের তোরণ পার হইয়া ভিতরের প্রাঙ্গণে যাইলে বামদিকেই ভোগ আনয়ন করিবার পথ। জগন্নাথদেবের মন্দির পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এবং (১) ভোগ মন্দির (২) নাটমন্দির (৩) জগমোহন, মোহন, বা দর্শন মন্দির ও (৪) বড় দেউল বা পীঠস্থান এই চারিভাগে বিভক্ত। ভোগ মন্দিরের কেবল পশ্চিমদিক অর্থাৎ জগন্নাথমূর্ত্তির দিকটী উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে। নাটমন্দিরে দেবদাসীগণ কীর্ত্তন করেন। জগমোহন হইতে দর্শক মণ্ডলী দেব দর্শন করেন। নাট মন্দিরের শেষ প্রান্তে দুটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রেলিং সংলগ্ন আছে। সেখান হইতে যাত্রীগণ নগ্নপদে জগন্নাথ দর্শন করেন। ইহাকে ধুলাপায় দর্শন বা "ঝাঁকি দর্শন" কহে। ভোগ মন্দিরের সম্মুখ ভাগে গরুড়স্তম্ভ বিদ্যমান আছে। এখানে প্রণাম করিতে হয়।

জগন্নাথদেবের মন্দিরকে বড় দেউল কহে। মন্দিরের ভিতর ১৬ ফুট দীর্ঘ, ১৩ ফুট প্রস্থ ও ৪ ফুট উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত রত্নবেদীর (মনিকোঠার) উপরে ওঁকাররূপী জগন্নাথদেব সুভদ্রা বলভদ্র ও সুদর্শন চক্র সহ বিরাজমান আছেন। নীলাদ্রি মহোদয়ের মতে পরিমাণে বলভদ্র ৮৫ যব, জগন্নাথদেব ৮৪ যব এবং সুভদ্রা ৫২ যব। জগন্নাথদেবের চক্ষুর্দ্বয় সম্পূর্ণ গোলাকার কিন্তু বলভদ্রদেবের



LITHO BY A.L. BAIN, CALCUTTA

চক্ষু বাদামাকর। আকৃতিগত আরও অনেক পার্থক্য আছে। বলভদ্রকে স্থানীয় লোক বড় ঠাকুর বলেন। জগন্নাথদেবের পার্শ্বে রজতময়ী সরস্বতী (মতান্তরে সত্যভামা), স্বর্ণময়ী লক্ষ্মীমূর্ত্তি এবং মাধবমূর্ত্তি আছেন, ইহাই সপ্ত শ্রীমূর্ত্তি। রথযাত্রা উপলক্ষে যখন সুদর্শন, জগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও বলভদ্রদেব গুণ্ডিচা মন্দিরে আসিয়া অবস্থান করেন, তখন সত্যভামা, লক্ষ্মী ও মাধবমূর্ত্তির পূজা ও ভোগ হয়। প্রদক্ষিণ করিবার জন্য রত্নবেদীর চতুর্দ্দিকে একটী অপ্রশস্ত পথ আছে। এই রত্নবেদীর অভ্যন্তরে লক্ষ শালগ্রাম শিলা আছেন। কথিত আছে কালাপাহাড় যে মূর্ত্তি দগ্ধ করিয়াছিলেন তাহার দগ্ধাবশেষ রত্নবেদীতে সমাহিত আছে। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে, ভগবানের অন্তর্বেদীটি পুণ্য জনক বলিয়া তাঁহাকে দেবতারাও বাঞ্ছা করেন। এইস্থানে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা সকলেই ভগবানরূপ দর্শন করেন। এই সপ্তবেদী বিষ্ণুর হৃদয় স্বরূপ এবং ইহার জন্য গৌরী, মঙ্গলা, বিমলা, সর্ব্বমঙ্গলা, অর্দ্ধাশনী, লম্বা, কালরাত্রি মরীচিকা ও চণ্ডরূপী নারী অষ্টপ্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অষ্টদিকে সংস্থিতা আছেন। অষ্টমূর্ত্তির দর্শন ও কীর্ত্তন করিলে সকল পাপ ক্ষয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। রুদ্রাণীর অষ্টপ্রকার ভেদ দর্শন করিয়া রুদ্রও আত্মাকে অষ্টধা ভেদ করিয়া কপাল মোচন, কাম, ক্ষেত্রপাল, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, নীলকণ্ঠ ও বটেশ্বর নামে অবস্থিতি করিতেছেন।

জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি অপেক্ষা তাঁহার রত্নবেদীই প্রকৃত সিদ্ধপীঠ। জগন্নাথদেব ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে বলিয়াছিলেন "তোমার মন্দির ভূমিসাৎ হইলেও আমি এইস্থান কখনও পরিত্যাগ করিব না। পরে যদি কেহ আমার মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেয় তাহাও তোমার কীর্ত্তি স্বরূপ গণ্য হইবে, এবং তোমার প্রতি প্রীতি বশতঃ আমি সেই মন্দিরে অবস্থিতি করিব, আমি তোমাকে ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, তোমার মন্দির ভূমিসাৎ হইলেও আমি এইস্থান কখনই ত্যাগ করিব না।"

মন্দিরের চতুর্দ্দিকে নিম্নলিখিত দেব ও দেবীমূর্ত্তি সমূহ বিরাজিত আছেন। অগ্নিকোণে চতুর্ভুজ সত্যনারায়ণ, তৎপশ্চিমে রাধাকৃষ্ণ, তৎপশ্চিমে নারায়ণের অংশ স্বরূপ অক্ষয়বট, তৎপূর্ব্বে বটবৃক্ষ। অক্ষয়বটের দক্ষিণদিকে গণেশ, মূলে মঙ্গলা, বায়ুকোণে মার্কণ্ডেশ্বর, ও পার্শ্বে ইন্দ্রাণী। বটবৃক্ষ সংখ্যায় দুইটী, পাণ্ডাগণ

বলেন উহার মধ্যে যেটী অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর সেটি অক্ষয়বট ও অপরটী উহার মূল হইতে উৎপন্ন। ইহার তলে বন্ধ্যানারী অঞ্চল বিস্তৃত করিয়া উপবিষ্ট থাকেন; যদি বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হয় তবে পুত্র লাভ অবশ্যম্ভাবী, পত্রাদি পড়িলে কন্যা জন্মে এবং কিছু না পড়িলে অদৃষ্টে পুত্র কন্যা নাই বুঝিতে হইবে। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে এই বটবৃক্ষটি ভগবানের বিরাট দেহ। মহাপ্রলয়ের প্রবল বায়ুতেও ইহার শাখাটিও কম্পিত হয় নাই। এই বৃক্ষের ছায়া স্পর্শে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট হয়। বটকৃষ্ণটি অতি ক্ষুদ্রমূর্ত্তি; মার্কণ্ডের প্রলয়কালে উঁহার কুক্ষিদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

ইহার পর অশ্বদ্বার, তৎপশ্চিমে সূর্য্যদেব তৎপশ্চিমে ক্ষেত্রপাল, তৎপশ্চিমে মুক্তিমণ্ডপ। এখানে শঙ্কর মঠ প্রভৃতির সন্ন্যাসীগণ এবং ব্রাহ্মণ মণ্ডলী উপবেশন করেন, অন্য কাহারও সেখানে গমন করিবার অধিকার নাই; এখানে শাস্ত্রীয় কথার আলোচনা এবং স্মৃতি বিষয়ক ব্যবহার শাস্ত্রের মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। তৎপশ্চিমে লক্ষ্মী, নৃসিংহ, তৎপশ্চিমে সিদ্ধিদাতা গণেশ ও তৎপার্শ্বে রৌহিণ কুণ্ড ও চতুর্ভুজ কাক। রৌহিণ কুণ্ডে এখন জল নাই। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে ইহার জল প্রলয় কালে বর্দ্ধিত হইয়া এই স্থানেই লীন হয় বলিয়াই ইহার নাম রৌহিণ তীর্থ। এই কুণ্ডের পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়াই ভুষণ্ডী বায়স-রাজ বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়াছিল। রৌহিণ কুণ্ডের পশ্চিমে বিমলাদেবী। বিমলাদেবীর মন্দিরের চন্দ্রাতপটী নানাবিধ শিল্প কার্য্য পরিপূর্ণ। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে যে "গয়ায়াং মঙ্গলানাম বিমলা পুরুষোত্তমে"। গয়ায় যে মঙ্গলাগৌরীদেবী আছেন পুরীতে তিনিই বিমলাদেবী নামে আখ্যাত। ৺শারদীয় পূজা উপলক্ষে বিমলাদেবীর মন্দিরে ছাগ বলি হয়। বিমলাদেবীর দক্ষিণে ভাণ্ডার গৃহ, উত্তরে গোপরাজনন্দ, তাহার উত্তরে কৃষ্ণবলরামের গোষ্ঠলীলা, তদুত্তরে ভাণ্ড-গণেশ।

ইহার পর খঞ্জদ্বার, তদুত্তরে মাখনচোর, তদুত্তরে গোপীনাথ, তদুত্তরে সরস্বতী, তদুত্তরে, নীলমাধব, তদুত্তরে লক্ষ্মী, ভদ্রকালী, ও সূর্য্যনারায়ণ, তৎপূর্ব্বে সূর্য্যদেব: তৎপূর্ব্বে পাতালেশ্বর মহাদেব ও তৎপার্শ্বে বলিরাজা।

ইহার পরে হস্তীদ্বার। বড় মন্দিরের নৈঋত কোণে একটী গরুড়ের গাত্রে যথেষ্ট পরিমাণে সিন্দুর সংলিপ্ত করিয়া ...

করণ করিয়া যাত্রীগণকে বুঝাইয়া দেন যে জগন্নাথদেব একাদশী বাঁধিয়া রাখিয়াছেন; সরল হৃদয়া সধবা বাঙ্গালী রমণীগণকে এইরূপে তাহারা প্রতারিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

নিত্য পূজা ও ভোগ।

নিত্যপূজা ও ভোগের ব্যয় জগন্নাথদেবের ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ও পূজার আয় হইতে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মন্দিরের ভিতরেই ধান্য কোঠা, ভাণ্ডার, রন্ধনশালা প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যমান আছে। ভোগের জন্য বিলাতি আলু, কুমড়া, কপি প্রভৃতি কখনই ব্যবহৃত হয় না। পাণ্ডাগণ রন্ধন ও ভোগ লইয়া যাইবার সময় মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখেন। প্রত্যেক ভোগের সময় মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয় এবং নাট মন্দিরে নৃত্য গীত হয়। ভোগ দুই রকমের হয়, মন্দির বা রাজবাড়ী হইতে যে ভোগ দেওয়া হয় তাহাকে কোট ভোগ বলে এবং মঠ হইতে বা যাত্রীগণ কর্ত্তৃক যে ভোগ প্রদত্ত হয় তাহাকে ছত্র ভোগ বলে। ভোগের বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে যে আয় হয় তাহা রাজার নামে জমা হইয়া থাকে।

প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে জনৈক পাণ্ডা মন্দিরের দ্বার রোধ ব্যাপার বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া, তাহা কাহারও কর্ত্তৃক কোনরূপে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই বুঝিয়া তবে তাহার দ্বারোদ্‌ঘাটনের আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

(১) প্রাতঃকালে দুন্দুভিধ্বনি আরতি দ্বারা জাগরণ, দন্ত ধাবন জন্য দন্তকাষ্ঠ প্রদান ও বস্ত্র পরিধান শেষ হইলে, বাল্যভোগ (বালভোগ বা সকালধূপো) হয়। ইহাতে ক্ষীর, ননি, দধি ও নারিকেল দেওয়া হয়।

(২) পূর্ব্বাহ্ন ভোগ দশটার সময় হয় ইহাতে খিচুড়ি ও পিঠা দেওয়া হয়।

(৩) মধ্যাহ্ন ভোগ (দুপার ধুপো) ১২ টার সময় হয়। ইহাতে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে। অনন্তর অপরাহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। দেবের "পঁহুড়" অর্থাৎ দিবা নিদ্রা হয়।

(৪) সন্ধ্যা ভোগ (বা সন্ধ্যা ধূপো) ইহাতে খাজা, গজা, মতিচুর পান্তাভাত প্রভৃতি দেওয়া হয়।

(৫) নৈশ ভোগ বা বড় শৃঙ্গার রজনীযোগে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রথমেই গীত গোবিন্দ তাহাতে অধীত হয়। নানাবিধ দ্রব্যাদি সে সময়ে প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং রাজবাটী হইতে "গোপাল বল্লভ" নামক মিষ্টান্ন ভোগ আসিয়া থাকে। ইহার পরে দেব দাসীগণের গীত হয়। অবশেষে রাত পঁহুড় জন্য দরজা বন্ধ হয়।

মঙ্গল আরতি সন্ধ্যা আরতি ও ধূপত্রয়ের শেষ হইলে সমস্ত যাত্রী ও স্থানীয় ব্যক্তিগণ জগন্নাথদেবের সমীপে গমন করিয়া অবাধে দর্শন করিতে পারেন. ইহাকে "সাহান মেলা" বা সাধারণ মেলা বলে।

জগন্নাথদেব সম্বন্ধে সাধারণ দৈনিক বিধি লিখিত হইল। ইহা ব্যতীত আর যে সকল বিধি তথায় নিত্য অনুষ্ঠিত হয় তাহা মাদলা পাঁজির সাহায্য ব্যতীত সেবকগণ পর্য্যন্ত ও সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত নহে।

মহাপ্রসাদ।

শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিয়া তীর্থযাত্রীগণের নূতন চুল্লী জ্বালিয়া অন্নাদিপাক করা নিষেধ। জগন্নাথদেবের প্রসাদ আনন্দবাজার নামক স্থানে বিক্রীত হইয়া থাকে। মুটেরা প্রসাদ মাথায় করিয়া লইয়া যায় এবং সেই প্রসাদ চণ্ডাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের মুখে তুলিয়া দিতে পারে। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে যে, প্রসাদ পাকের জন্য বহু লোক নিযুক্ত আছে বটে কিন্তু স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী ঐ অন্ন পাক করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং নারায়ণ তাহা ভোজন করেন। এই প্রসাদ ভক্তিসহকারে শিরে ধারণ করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হয়। দেবগণ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া এই মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করেন। এই নিবেদিতান্ন হরির অপর মূর্ত্তির স্বরূপ, সুতরাং পবিত্রতা জনক ও মুক্তিপ্রদ। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পাচকগণের সংস্পর্শ জন্ত কোনও দোষ সঞ্চার হয় না। কারণ কমলার সান্নিধ্য বশতঃ তাহারা সকলেই শুচি হইয়া থাকে। বিধবা, ব্রতস্থ ও দীক্ষিত মানবগণও মহাপ্রসাদ ভক্ষণে পবিত্র হইয়া থাকেন। উহা ভক্ষণ করিলে সর্ব্বরোগ শান্তি, পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি, দারিদ্র নাশ, দীর্ঘায়ু ও সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে, বলিয়া ঐ মহাপ্রসাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভক্ত মালগ্রন্থে লিখিত আছে দেবী বলিতেছেন "শ্রীপুরুষোত্তমে আমি সদা করি বাসে। বিমলারূপেতে কেবল প্রসাদের আশে।" মহাপ্রসাদ বহুদিনের পর্য্যুষিত বা অজীর্ণ [illegible]

সর্ব্বপাপ বিলীন হয়। কথিত আছে যে কোনও লোক মহাপ্রসাদ অবজ্ঞা করিয়াছিল বলিয়া তাহার হস্ত-পদ খসিয়া গিয়াছিল। পরে বহুদিন অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া একদা সে ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া কুক্কুর মুখ ভ্রষ্ট প্রসাদ ভোজন করিয়াছিল তাহাতে জগন্নাথদেব অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে হস্ত-পদাদি প্রদান করিয়াছিলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে চৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রধামে আগমন করিয়া অনেক নূতন উৎসবের প্রবর্ত্তন করেন। মহাপ্রসাদের প্রাধান্যও ঠিক ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। চৈতন্যদেব রাজার সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে মহাপ্রসাদ আহার করাইয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য উত্তরোত্তর চতুর্দ্দিকে উদ্ঘোষিত হইয়াছিল।

মহাপ্রসাদকে সাধারণ অন্ন স্বরূপ গণ্য করিলে নরক বাস সংঘটিত হইয়া থাকে। জনসাধারণের ধারণা এই যে মহাপ্রসাদ অবজ্ঞা করিলে স্কন্ধদেশ কাঠিন্যভাব ধারণ করে। শুষ্ক মহাপ্রসাদ বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে, এবং বিদেশীয়গণ তাহা ক্রয় করিয়া স্বস্বদেশে লইয়া যায়। এখানে জাতিভেদ না থাকায় নীচজাতি স্পর্শ করিলে উহা অপবিত্র হয় না। এই জন্যই কেহ কেহ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে এখানে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যেও যে জাতিভেদ ছিলনা এমত নহে। "The Budhists of India never gave up their caste symbols" Mitra's Budh Gya. বহুকাল পূর্ব্ব হইতে শবরগণ জগন্নাথের ভোগ প্রস্তুত করিত। পরে ইহাদিগকেই যজ্ঞোপবীত দিয়া "বলভদ্র" গোত্রীয় স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ করা হইয়াছিল। পুরুষোত্তমে একাদশী দেবীকে বন্ধন করিয়া রাখা হইয়াছে, বিধবাগণকে একাদশীর দিনে অনশনে থাকিতে হয় না। বিষ্ণুপুরাণ ভাগবৎ-পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, বরাহপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত আছে।

জগন্নাথদেবের বেশ।

প্রাতঃকালে মঙ্গল আরতি বেশ, অপরাহ্নে প্রহর বেশ, ও সন্ধ্যারপরে বড় শৃঙ্গার বেশ হয়। ইহা ভিন্ন আরাম বেশ, বুদ্ধ বেশ, বামন বেশ প্রভৃতি অনেক বিভিন্ন প্রকারের বেশও আছে। স্নান যাত্রার দিনে জগন্নাথদেবের

গণপতি বেশ হয়। রঘুনাথ বেশ দেখিলে দর্শককে সুখে গর্ব্বিত বা দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না। নৃসিংহ বেশ দেখিলে মহাপাপীর গর্ব্ব ও খর্ব্ব হয়, এবং চন্দন যাত্রা বেশ দর্শন করিলে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় জগন্নাথদেবকে স্বর্ণনির্ম্মিত হস্ত-পদ পরাইয়া রাজবেশে সজ্জিত করা হয়। সোনার পদ্মের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া পদ্মবেশ করা হয়। জগন্নাথদেবের হস্তে কৃত্রিম পর্ব্বত স্থাপন করিয়া গোবর্দ্ধন বেশ এবং প্রকাণ্ড কালীয় নাগের ফণার উপর সজ্জিত করিয়া কালীয়দমন বেশ করা হয়। উড়িয়্যাবাসীগণ ঠাকুর সজ্জা সম্পাদনে সিদ্ধহস্ত!

নবযৌবন ও নবকলেবর।

প্রতি বৎসর স্নান যাত্রার অন্তে জগন্নাথদেবের কলেবর চিত্রিত হইয়া থাকে এবং দেবমূর্ত্তি গুলিকে বহুমূল্য বেশভূষায় ভূষিত করিয়া রত্নবেদীর উপরে স্থাপিত করা হয়। এই উৎসবের নাম নবযৌবনোৎসব। প্রতি দ্বাদশ বৎসরান্তে দেবতার নূতন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বিদ্যাপতির বংশধর পতি মহাপাত্র * পুরাতন মূর্ত্তি হইতে বিষ্ণুপঞ্জর (ব্রহ্মমণি বা ব্রহ্ম পদার্থ) গ্রহণ করিয়া নূতন মূর্ত্তি মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন এবং জীর্ণ কলেবর মাধব নাট্টার মধ্যে প্রোথিত করা হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন উহা বুদ্ধ-দেবের শরীরের অংশ বিশেষ। হিন্দুগণের ধারণা উহা শালিগ্রাম শিলা অথবা আদি দারুব্রহ্মের দারুখণ্ড বিশেষ। বিষ্ণুপঞ্জর নূতন দেহে স্থাপন করিবার সময় প্রধান পাণ্ডার চক্ষু আবৃত করিয়া দেওয়া হয়, কারণ ইহা নয়নগোচর করিবামাত্র মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

কথিত আছে বর্দ্ধমানের কোনও রাজা কথিত নবকলেবর গঠন ব্যাপার দর্শন করিবার জন্য প্রধান পাণ্ডাকে অনেক অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহাকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। জীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ কালে প্রধান পাণ্ডার ১০ দিন অশৌচ হয়। আষাঢ় মাসে যদি দুইটী পূর্ণিমা বা মল মাসের সঞ্চার হয় তাহা হইলে নবকলেবর সংঘটিত

* বর্ত্তমান পতিপাত্রের নাম রামকৃষ্ণ পতিমহাপাত্র। পুনর্যাত্রার দিন তিনি আপন বাটিতে অন্নরন্ধন করিয়া মহাপ্রভুর ভোগ দেন।

হইয়া থাকে। নবকলেবর উৎসব সময়ে খোর্দ্দারাজ একজন সাধুকে হত্যা করার অপরাধে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন বলিয়া, পুনরায় অনিষ্ট আশঙ্কায় রাজবাড়ী হইতে আর নবকলেবর ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে দেওয়া হইত না, কেবল মূর্ত্তিগুলির পূর্ণ সংস্কার মাত্র হইত। সন ১৩২০ সালে নবকলেবর উৎসব হইয়াছে। মাদলা পঞ্জীতে লিখিত আছে কোনও কোনও পুরীরাজের রাজত্ব সময়ে দুই তিনবার পর্য্যন্ত নবকলেবর হইয়াছিল। নবকলেবরউৎসব ব্যাপারে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১৮৫৩ এবং ১৮৭১ খৃঃঅব্দে শ্রীমূর্ত্তির নবকলেবর উৎসব সমাহিত হইয়াছিল। হিন্দুদিগের বিশ্বাস, যে নবযৌবন বেশ সর্ব্বপ্রথমে দর্শন করে সে সশরীরে স্বর্গারোহণ করে। নবকলেবর নির্ম্মাণ পদ্ধতির নিয়মও অতীব কঠোর। অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে জগন্নাথদেবের আজ্ঞা লইয়া দণ্ডকারণ্যে অথবা প্রাচীতীরে অনুসন্ধান করিয়া শঙ্খচক্রাদি চিহ্নিত তিনটী নিম্ব বৃক্ষ নির্ব্বাচন করিয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাহাদিগকে ছেদন করিতে হয়। যে পরিমাণ দারু মূর্ত্তি গঠন পক্ষে আবশ্যক সেই পরিমাণ দারু বস্ত্রাবৃত করিয়া আনয়ন করিতে হয় এবং অবশিষ্ট শাখা প্রশাখা মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিতে হয়।

উৎসব।

১। প্রতিষ্ঠা উৎসব—বৈশাখী শুক্ল অষ্টমীতে পুষ্যা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবার রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে এ যাবৎ প্রতি বৎসর ঐ দিনেই উৎসবের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। ইহাকে নীলাদ্রি মহোদয় কহে।

২। রুক্মিণী হরণ।—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল একাদশীতে জগন্নাথদেবের প্রতিনিধি গুণ্ডিচা বাগানে রুক্মিণী হরণ করিয়া অক্ষয় বটমূলে তাঁহাকে বিবাহ করেন, ৩। চন্দন যাত্রা, ৪। স্নান যাত্রা, ৫। রথ যাত্রা, ৬। ঝুলন যাত্রা, ৭। জন্মাষ্টমী, ৮। কুয়ার পুণৈ (রাস যাত্রা) ৯। মকর সংক্রান্তি ১০। দোল যাত্রা, ১১। রাম নবমী। ইহা ভিন্ন, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, উত্থান একাদশী, ভীম একাদশী, নব পত্রিকা, শিবরাত্রি প্রভৃতি বহুবিধ উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীগণের জন্য পুরীধামে ভিন্ন ভিন্ন উৎসব হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা উৎকলবাসীগণের, দোল

যাত্রা উত্তর পশ্চিম অঞ্চল বাসীদিগের এবং রথ যাত্রা বঙ্গবাসীগণের উৎসব।

চন্দন যাত্রা।

বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়ায় অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল; এই তিথিতেই পতিতপাবনী জহ্নুনন্দিনী ভগীরথের কঠোর সাধনায় মর্ত্তলোকে অবতরণ করেন। এই পুণ্য তিথির অপরাহ্নে জগন্নাথ-দেবের প্রতিনিধি মদনমোহন, লক্ষ্মী ও সত্যভামা দেবীর সহিত বিমানা-রোহনে নরেন্দ্র সরোবর তীরে গমন করেন। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্য উৎকল জয় করিতে যাত্রা করিয়া জগন্নাথদেবের প্রতিনিধি গোবিন্দদেবকে লইয়া টাকির সন্নিকটে রায়পুরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি নরেন্দ্র সরোবরে চন্দন যাত্রায় গোবিন্দদেবের পরিবর্ত্তে মদনমোহনের শুভ পদার্পণ হইয়া থাকে।

আর একখানি বিমানে রামকৃষ্ণ এবং অপর আর একখানিতে পুরীধামের প্রসিদ্ধ শিবমূর্ত্তি-পঞ্চক লোকনাথ, যমেশ্বর, কপালমোচন, মার্কণ্ডেশ্বর ও নীলকণ্ঠেশ্বর বিজয় প্রতিমা ধাতুমূর্ত্তি সেখানে গমন করেন। এই পাঁচটী মূর্ত্তির নাম, পঞ্চপাণ্ডব মূর্ত্তি। কেন যে ইঁহাদের নাম পঞ্চপাণ্ডব মূর্ত্তি হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। মন্দির হইতে সরোবরে যাইবার পথে তিনটী বিমান, রাজবাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে। এই সময় জগন্নাথদেবের রথ নির্ম্মাতা সূত্রধর মদনমোহনের সম্মুখে আগমন করিলে তাহাকে রথ নির্ম্মাণের আজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে।

যেমন এইদিন হইতেই রথ যাত্রা আরম্ভের সূচনা হয়, তেমন দোল যাত্রার পরবর্ত্তী দিবসে বিমানারোহণে মদনমোহনকে নরেন্দ্র সরোবরে লইয়া যাওয়ার ব্যাপারে নরেন্দ্র যাত্রার আরম্ভ হয়। পথের উভয় পার্শ্বে পংক্তিভোগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মহাপ্রভু ক্রমে ক্রমে ভোগ ভক্ষণ করিতে করিতে সরোবর সমীপে গমন করেন। পথিমধ্যে দেবদাসীর ও নাচপিলাগণের নৃত্যগীত হইতে থাকে। নরেন্দ্র সরোবরের স্বচ্ছ বক্ষে একখানি নৌকায় মদনমোহন, লক্ষ্মী, ও সত্যভামা এবং আর এক খানিতে রামকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব আরোহণ করেন। প্রথম খানিতে দেবদাসীগণ নৃত্য করেন এবং দ্বিতীয় খানিতে 'পিলা' বা বালকের নাচ হয়। উল্লিখিত উভয় নৌকাকে লইয়া সরোবরে



স্নানমঞ্চে জগন্নাথ দেব।

চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া বেড়ান হয়। এই সময়ে যাত্রীগণ সর্ব্বাঙ্গে যথেষ্ট তৈল মর্দ্দন করিয়া অবগাহন ও সন্তরণ করিতে থাকেন, ইহাকে চন্দন যাত্রার "মৌজ" বলে। এই উৎসব ২১ দিন ধরিয়া চলিতে থাকে। উড়িষ্যাবাসী লোক মাত্রকেই বৎসরের মধ্যে একদিন না একদিন উক্ত মৌজোৎ-সবানুষ্ঠান করিতেই হইবে। পুরীর রাজা পর্য্যন্তও উক্ত প্রথা-মুক্ত নহেন।

সরোবরের মধ্যে যে তিনটী মন্দির আছে তাহার মধ্যে বৃহত্তমটীর মধ্যভাগে একটী কূপ আছে, সেই কূপোদকে মদনমোহন, লক্ষ্মী ও সত্যভামা দেবীকে একটী বড় চৌবাচ্চায় স্নান করান হয়। দ্বিতীয় মন্দিরে রামকৃষ্ণ এবং তৃতীয়টীতে পঞ্চপাণ্ডব থাকেন। এখানে দেবগণের পূজা ও ভোগ হয়।

সন্ধ্যাগমে সরোবরের উত্তর তীর ও উক্ত মন্দিরগুলি দিব্য আলোক মালায় বিভূষিত হয়। তৎসংক্রান্ত নানাবিধ উৎসব ব্যাপার সম্পন্ন হওয়ার পর দেবগণ পূর্ব্ববৎ তিনখানি বিমানে আরোহন করিয়া প্রত্যাগমন করেন। গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি হয়। ২১ দিনই দেবগণ এইরূপ গমনাগমন করেন। চন্দন যাত্রার অপর নাম 'গন্ধ লেপন যাত্রা'।

স্নান যাত্রা।

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে মন্দির হইতে জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলভদ্র ও সুদর্শনচক্রকে আনয়ন করিয়া স্নান মঞ্চোপরি স্থাপন করিয়া "সোনাকূপ" হইতে সুবর্ণ কলসে ১০৮ কলস জল আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে স্নান করান হয়। ঐ দিন স্নানমঞ্চ উত্তমরূপে সজ্জিত ও মূল্যবান চন্দ্রাতপ দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। সুদর্শন ও সুভদ্রাদেবী বাহকের স্কন্ধে ও জগন্নাথ এবং বলভদ্র "পদব্রজে" স্নানমঞ্চে আগমন করেন। জগন্নাথ ও বলভদ্রদেবের কটিদেশে রেশম ডুরি বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে শিশুদের ন্যায় "হাঁটী হাঁটী পা, পা" করিয়া লইয়া যাওয়ার নাম 'পদব্রজে' আসা।

যাহারা স্নানকালে ভগবানকে নিরীক্ষন করে তাহাদিগকে আর কখনও জননীর গর্ভোদকে স্নান করিতে হয় না। যে ব্যক্তি জগন্নাথের স্নান দর্শন করে তাহার যজ্ঞ অনুষ্ঠান, মহাদান, কোটী কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে কোটী কোটী পিণ্ডদান, পুণ্যকালে তীর্থাদিতে তপশ্চারণ এবং অর্দ্ধোদয়াদি যোগে কোটী কোটী তীর্থে কোটী কোটী বার স্নান করার ফল

লাভ হয়। জ্যেষ্ঠ পূর্ণিমা যদি বৃহস্পতিবারে হয় এবং ঐ দিনে যদি চন্দ্র ও বৃহস্পতি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তাহাকে মহাজ্যৈষ্ঠী পৌর্ণমাসী কহে। মহাজ্যৈষ্ঠী পৌর্ণমাসী মহাপুণ্য জনক, ঐ দিন জগন্নাথের স্নান দর্শন করিলে ব্যক্তিমাত্রেই সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া থাকে। স্নান যাত্রায় আগমন ও প্রত্যাগমন দর্শন মহাপুণ্য সঞ্চারক। স্নান যাত্রায় দেবের স্নানের সময় নানা বর্ণের রঙ্গ ধুইয়া যে জল পড়ে তাহা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু পবিত্রতম পদার্থ জ্ঞানে লইয়া যায়।

স্নান যাত্রার সময় লক্ষ্মীদেবী "চাহনি মণ্ডপে" অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্নানোৎসব দর্শন করেন। স্নান যাত্রার পর ১৫ দিন জগন্নাথদেব জগমোহনের পার্শ্বেই 'নিরোধন' (আঁতুড়) গৃহে অবস্থান করেন। এই কয়দিন পাকশালার কার্য্য স্থগিত থাকে, এবং ঐ কয়দিন কাহারও দেবদর্শন লাভ হয় না। পাণ্ডারা বলেন স্নান যাত্রার সময় স্নান করিয়া জগন্নাথদেবের জ্বর হয়। মহামন্দিরে এই কয়দিন পূজা বন্ধ থাকে। কিন্তু একটি বংশাবৃত স্থানে চিত্র বিচিত্র বস্ত্রাচ্ছাদনের ভিতর প্রভুকে রাখিয়া যথাসময়ে স্নান ও পূজা করান হয়। এই সময়ের পূজার উপকরণ মাত্র মিছরী ও চিনির জল।

পক্ষগতে জগন্নাথদেবের 'চক্ষুদান' কার্য্য সম্পন্ন হয়, এবং তাঁহার আচ্ছাদনবস্ত্র অপসারিত হয়। তদ্দিনকৃত উৎসবকে "নেত্রোৎসব" কহে। ইহারই অপর নাম 'নবযৌবনোৎসব' এবং চলিত ভাষায় ইহাকে 'টাটিভাঙ্গা দর্শন' বলে।

স্নান যাত্রার ৫।৬ দিন পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিক হইতে তীর্থ যাত্রীগণ আগমন করেন এবং রথ যাত্রা দর্শন অন্তে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে ৺পুরীধামে যেরূপ বিষম জনতা হয় অন্য কোনও সময়ে তাদৃশ নহে। স্নানমঞ্চ বহিঃপ্রাঙ্গন মধ্যে এত উচ্চে স্থাপিত যে বড়দাঁড় রাস্তা হইতে যাত্রীগণ সুচারুরূপে স্নানযাত্রা দর্শন করিয়া স্বস্বনেত্র মন চরিতার্থ করিয়া মনে মনে বিমল আনন্দপ্রসাদ উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

রথযাত্রা।

জগন্নাথদেবের রথযাত্রা পুরীধামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। ইহার অপর নাম 'নবদিনাত্মিকা উৎসব' বা মহাবেদী উৎসব। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে ভগবান

বলিয়াছিলেন আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সুভদ্রার সহিত আমাকে ও বলরামকে রথে আরোহণ করাইয়া রথযাত্রারূপ মহোৎসব সম্পন্ন করিবে, এবং যে স্থানে আমি পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলাম ও যে স্থানে ত্বদীয় সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের মহাবেদী বিরাজমান, সেই গুণ্ডিচা মণ্ডপে আমাদিগকে লইয়া যাইবে।

বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথি হইতে রথ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। রথের কাষ্ঠাদি উড়িষ্যার রাজাগণ প্রতিবৎসর প্রেরণ করিয়া থাকেন। সূত্রধর, চিত্রকর ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আয়ের সম্পত্তি প্রদত্ত আছে তাহার জন্য তাহারা প্রতিবৎসর এই সময়ে তাহাদের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

মন্দিরের পূর্ব্বদিকে অরুণস্তম্ভ হইতে গুণ্ডিচা মন্দির পর্য্যন্ত যে সুবিস্তৃত রাজপথ প্রসারিত আছে তাহার নাম বড় দাঁড় বা বড় দাণ্ড এবং রথ তাহার উপর দিয়াই আকর্ষিত হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর নূতন রথ প্রস্তুত হয়। পুরাতন রথের কাষ্ঠাদি জগন্নাথদেবের ভোগ রন্ধনে ব্যবহৃত হয়। শুনিয়াছি এই কাষ্ঠে শবদাহন কার্য্যও সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরম পবিত্র কাষ্ঠ বোধে অনেকে উহা ক্রয় করিয়া লইয়া যান। জগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও বলভদ্র-দেবের জন্য পৃথক পৃথক তিনখানি রথ প্রস্তুত হয়, জগন্নাথের রথের নাম "নন্দীঘোষ"; উহার চূড়ায় চক্র ও গরুড় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ঐ রথকে চক্রধ্বজ বা গরুড়ধ্বজও বলে। ইহা ২৩ হাত উচ্চ এবং ইহাতে পাঁচ হাত পরিধি বিশিষ্ট ১৬ খানি চাকা থাকে। বলভদ্রের রথ জগন্নাথদেবের রথ অপেক্ষা এক হাত ছোট। এই রথের শীর্ষভাগে তাল চিহ্ন থাকে বলিয়া ইহার নাম 'তালধ্বজ'। ইহার অপর নাম 'লাঙ্গলধ্বজ'। ইহা ২২ হাত উচ্চ এবং ইহাতে সাড়ে ৪ হাত পরিধি বিশিষ্ট ১৪ খানি চাকা থাকে। সুভদ্রাদেবীর রথের নাম 'পদ্মধ্বজ' বা 'দবদলন'। ইহা ২১ হাত উচ্চ এবং ইহাতে ৪ হাত পরিধি বিশিষ্ট ১২ খানি চাকা থাকে। রথের চূড়াদেশ হইতে চক্রের উপরিভাগ পর্য্যন্ত সমগ্র অবকাশ স্থানটীকে মূল্যবান বস্ত্র ও জরি প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করা হয়। রথের শিরোভাগে বহু বিচিত্র বর্ণের পতাকা নিরন্তরই পত পত উড়িতে থাকে। রথের উপর এক অপূর্ব্ব আকারের ঘোটক থাকে তাহার

পশ্চাতে সারথি, তাহাকে উড়িয়াবাসীগণ 'ডাহুক' বলে। ডাহুক নানাবিধ কুৎসিত গালি-পূর্ণ গীত গাহিলে কালবেড়িয়াগণ রথ টানিয়া থাকে। রথারোহাণার্থ মন্দির হইতে জগন্নাথদেবের আগমন ব্যাপারকে 'পহণ্ডি বিজয়' বলে। বঙ্গবাসীগণ ইহাকে পাণ্ডু বিজয় কহে।

মূর্ত্তিত্রয়ের রথাবস্থান ব্যাপারকে সাধারণতঃ পহণ্ডি নামে অভিহিত করা হয়। প্রথমে বলরামের, তাহার পর সুভদ্রার ও তৎপশ্চাতে জগন্নথদেবের পহণ্ডি হইয়া থাকে। জানিনা কোন্ গূঢ় দুর্জ্ঞেয় কারণবশে রথ যাত্রার পূর্ব্বরাত্রে এবং পহণ্ডির অব্যবহিত পূর্ব্বে পাণ্ডাগণ জগন্নাথদেবের প্রতি অযথা অশ্রাব্য গালি বর্ষণ করিয়া তদীয় গাত্রে বেত্রাঘাত করেন। তাঁহারা বলেন যে জগন্নাথদেবের প্রতি এরূপ অশিষ্ট আচরণে তিনি অপেক্ষাকৃত লঘু ভারাবস্থাপন্ন হন, এবং পদব্রজে সেই অবস্থায় তাঁহাকে লইয়া যাইবার এবং রথে তুলিবার পথ অধিকতর সুগম হইয়া থাকে। সুদর্শন-চক্র জগন্নাথদেবের রথেই বিরাজমান থাকে। ভগ্নি সুভদ্রাদেবী পাণ্ডাগণের ক্রোড়যোগে রথারোহণ করিয়া থাকেন। জগন্নাথ ও বলভদ্রদেবকে দয়িতাগণ রজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করিয়া রথে উত্তোলন করেন। জগন্নাথের মন্দিরে বহুকাল হইতে কতকগুলি বৃত্তিভোগী শূদ্র আছে, তাহাদের নাম দয়িতা, দৈত্য বা দৈত্যপতি। ইহাদিগকে কালবেড়িয়াও বলা হয়। ইহারা যাত্রীদের সঙ্গে রথ টানে। পূর্ব্বে জগন্নাথদেবের রথে চৌদ্দশত, বলরামের রথে ১২ শত ও সুভদ্রাদেবীর রথে ১২ শত বেঠিয়া নিযুক্ত হইত। দয়িতাগণ জগন্নাথদেবের কুটুম্ব মধ্যে পরিগণিত। কলেবর ত্যাগের সময় তাহাদের অশৌচ হইয়া থাকে। রথযাত্রার সময় যাত্রীগণ-প্রদত্ত প্রণামী ইহাদের প্রাপ্য। অধুনা বেঠিয়ার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত হ্রাস করা হইয়াছে। দয়িতা অর্থে ভগবানের "প্রিয়" হইতেও পারে। "রথেচ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্মো ন বিদ্যতে" ইহার অর্থ যাহাই হউক না কেন রথে জগন্নাথদেবকে দেখিবার জন্য হিন্দুমাত্রেই যারপর নাই উৎসুক ও ব্যগ্র হইয়া থাকে এবং রথের নির্দ্দিষ্টদিনে ৺পুরীধামে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। লক্ষ যাত্রীর বিশ্বাস, যে জগন্নাথদেবকে সর্ব্ব-প্রথমে দর্শন করিবে সে সশরীরে স্বর্গধামে গমন করিবে

চিরন্তন প্রথা অনুসারে পুরীর রাজা স্বর্ণমণ্ডিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা রথের

সম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার করিয়া থাকেন। এবং স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি অনুসারে রথের আকর্ষণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রত্যেক রথের চতুর্দ্দিক রজ্জুদ্বারা বেষ্টিত গণ্ডির মধ্যে সেবায়ৎগণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন। পূর্ব্বে সিংহদ্বার হইতে গুণ্ডিচা মন্দির পর্য্যন্ত গমন করিতে ২।৩ দিন বা ততোধিক কাল লাগিত, কিন্তু এক্ষণে একদিনেই সে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। গুণ্ডিচা মন্দিরে প্রভুর উপবেশন ও অন্নভোগ না হইলে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত রথযাত্রা বন্ধ হইয়া যাইবে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জগন্নাথের রথচক্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিলে আপনাকে মহাপুণ্য-বান মনে করিত, কিন্তু বর্ত্তমান কালে পুলিশের সুবন্দোবস্ত গুণে সেরূপ আর হইতে পায় না। রথের দিনে নানাস্থান হইতে কীর্ত্তন সম্প্রদায় আসিয়া কীর্ত্তন ব্যাপারে মন খুলিয়া যোগ প্রদান করিয়া থাকেন। একবার চৈতন্য-দেবের সময় রথের পট্টডোরী ছিন্ন হওয়ায় চৈতন্যদেব কুলিনগ্রাম নিবাসী রামানন্দ রায়কে আহ্বান করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন তোমরা এই ডোরী গ্রহণ কর এবং অতঃপর প্রতিবারেই তোমাদিগকে এই পট্টডোরী লাগাইতে হইবে। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ শ্রীরথের ডোরী সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। রথযাত্রা উপলক্ষে মূর্ত্তিত্রয়কে নানাবিধ বহুমূল্য কারুকার্য্য খচিত পরিচ্ছদে সজ্জিত করা হয় এবং সে সময়ে তাঁহাদের দেহে স্বর্ণনির্ম্মিত হস্তপদ সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। জগন্নাথদেবের মন্দির ও গুণ্ডিচা বাগানের প্রায় মধ্যপথে বর্ত্তমান বালগণ্ডি নামক স্থানে পূর্ব্বে নদী স্রোত প্রবাহিতা ছিল। বর্ত্তমানে আর তাহার অস্তিত্ব নাই। তাহার একতীরে গুণ্ডিচা মন্দির ও অপর তীরে অর্দ্ধাশনীর মন্দির বর্ত্তমান ছিল। অর্দ্ধাশনীকে লোকে মাসীমা বলে। জনশ্রুতি এই যে পূর্ব্বে রথযাত্রার জন্য ছয়টী রথ প্রস্তুত থাকিত। গুণ্ডিচা মন্দির হইতে নদীতীর পর্য্যন্ত জগন্নাথদেব তিনখানি রথে আগমন করিয়া নৌকাযোগে নদী উত্তীর্ণ হইয়া অপর পারস্থিত অপর তিনখানি রথযোগে মন্দিরে গমন করিতেন। এই বালগণ্ডির একদিকে অসংখ্য ব্রাহ্মণের বাস এবং অপরদিকে জগন্নাথদেবের জগন্নাথ বল্লভ নামক কানন। উক্ত নদীর মনোরম সৈকত "সারধা" বলিয়া পরিচিত। মাতৃস্বসা সমীপে তণ্ডুল কণার প্রস্তুত পিষ্টক প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জগন্নাথদেব গুণ্ডিচা

মন্দিরে গমন করেন না। মাসীর আবাস স্থান সম্বন্ধে বৌদ্ধগণ বলেন এই মাতৃস্বসা গৌতমী বা মহাপ্রজাবতী দেবী। শৈশবে জননী মায়াদেবীর বিয়োগের পর বুদ্ধদেব মাতৃস্বসার নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

রথ চালাইবার সময় পথে যাত্রীগণকে উৎসাহিত করা হয়, এবং তাঁহারা উত্তরোত্তর সমধিক উৎসাহের সহিত রথ টানিয়া লইয়া যান। প্রথম রথের দিনে যেরূপ লোক সমাগম হয়, উল্টারথ উপলক্ষে তাদৃশ হয় না। রথোৎসবের পর পঞ্চমীর রাত্রে লক্ষ্মীদেবীকে বিশেষ সমারোহে জগন্নাথদেবের সহিত দর্শনার্থে লইয়া যাওয়া হয়। তাহাকে 'হোরা পঞ্চমী' বা 'হোড়া পঞ্চমী' উৎসব কহে। জগন্নাথ গুণ্ডিচা মন্দিরে গমন করিলে লক্ষ্মীদেবী ক্রোধের বশীভূত হইয়া লোকগণকে প্রহার করিয়া বন্ধন করেন। পরে জগন্নাথদেবকে আনিয়া দিতে স্বীকৃত হইলে পর তাহাদিগকে বন্ধন মুক্ত করেন। পাণ্ডাগণ বলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরাম সঙ্গে ছিলেন বলিয়া জগন্নাথ লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে না লইয়া ভগ্নি সুভদ্রাদেবীকে লইয়া গুণ্ডিচা বাটিতে গিয়াছিলেন সেই অভিমানে লক্ষ্মীদেবী রথচক্র ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে হোড়া পঞ্চমীর রাত্রে জগন্নাথের রথের একস্থানের কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

গুণ্ডিচা মন্দিরে জগন্নাথদেবের সাতদিন অবস্থিতি কালে সেখানে ভোগ প্রভৃতির রন্ধন হয় এবং অসংখ্য তীর্থযাত্রী দেবদর্শনার্থে তথায় গমন করে। পুন র্যাত্রার দিন রথগুলিকে নীলাদ্রিরদিকে অভিমুখী করিয়া রাখা হয় ইহাকে 'দক্ষিণ মূর্ত্তি' কহে। সেইদিন তিনখানি রথে মূর্ত্তিত্রয় মহামন্দিরে আনীত হইয়া থাকেন এবং তদুপলক্ষে সকল জাতির সংস্পর্শ জনিত দোষ দূরীকরণার্থ যথাবিহিত সংস্কার কার্য্য সাধন করা হইয়া থাকে।

উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে রথস্থিত জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে দর্শন করিলে মানবের কোটীশত জন্মার্জ্জিত পাপ অপগত হইয়া থাকে। এই মহাবেদী রথবিহার মহোৎসব অপেক্ষা অধিক শ্রেয়স্কর বিষ্ণূৎসব আর নাই। রথযাত্রাকে গুণ্ডিচাযাত্রা, নন্দীঘোষ বা পতিত পাবন যাত্রা কহে।

ফরাসি পর্য্যটক ফাঁসোয়া বর্ণিয়ে সাহাজাহানের রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং পুরুষোত্তমের রথযাত্রা সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ শ্রমন হিয়ং থিসং ও উৎকলে আসিয়াছিলেন।

দোলযাত্রা।

কেবল স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথদেব স্বয়ং বিরাজমান হন। দোলযাত্রা চন্দনযাত্রা প্রভৃতি উপলক্ষে তাঁহার প্রতিনিধি মদনমোহনদেব বিমানারোহণে গমন করেন। মন্দিরের উত্তরদিকে লক্ষ্মী বাজারের নিকট দোলমঞ্চ বিদ্যমান আছে। দোলযাত্রা ফাল্গুন মাসের দশমীতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমার দিনে সমাপ্ত হয়। প্রত্যেক দিবস সন্ধ্যাধূপের শেষে লোকনাথ, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর, নীলকণ্ঠ এবং কপালমোচনের পঞ্চ বিমানের সহিত ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি এবং লক্ষ্মী সরস্বতী মনিখচিত বিমানে বিরাজমান হইয়া জগন্নাথ বল্লভের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তণ করেন। দোল পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় দোল মণ্ডপের আগ্নেয় কোণে বহ্ন্যুৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণিমার দিন প্রাতে মদনমোহন লক্ষ্মী ও সত্যভামা দেবীকে সঙ্গে লইয়া বিমানারোহণে দোলমঞ্চে গমন করেন এবং হস্তীদন্ত নির্ম্মিত দোলায় বিরাজিত হয়েন। এই সময় প্রভুর সর্ব্বাবয়ব আবীররঞ্জিত হয়। নানাদেশ হইতে যাত্রীগণ আগমন করিয়া দোলমঞ্চস্থ মদনমোহন দেবকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হয়েন। এই সময় পশ্চিমাঞ্চল হইতে অনেক লোকের সমাগম হয়, এবং রেলকোম্পানি যাত্রিগণের সুবিধার জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত প্রচুর পরিমাণে করিয়া থাকেন। দোলমঞ্চের চতুর্দ্দিকে এবং বড়দাণ্ডের উপরিভাগে নানাবিধ সামগ্রীর বিপণি শ্রেণীর সমাবেশ হইয়া থাকে। শান্তিরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে পুলিশ প্রহরা উপস্থিত থাকেন। সন্ধ্যার পর মদমোহনদেব বিমানারোহণে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তণ করেন। স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে যে পরিমাণে লোক সমাগম হয় দোলযাত্রা প্রভৃত ব্যাপারে তাদৃশ হয় না।

দশাবতার ক্ষেত্র।

বিভু নারায়ণ সর্ব্বোত্তম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই লোকরক্ষার্থ বহুবিধ অবতার মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছিলেন বলিয়া বুধগণ উক্ত পরম স্থানকে ভৌম ও দিব্য বলিয়া থাকেন। মৎস্যাদি দশাবতার মূর্ত্তি দর্শন করিলে যে ফল লাভ হয়, মাত্র পুরুষোত্তম দর্শন করিলেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকে সাধারণতঃ লোকে "দশাবতার ক্ষেত্র" বলে।

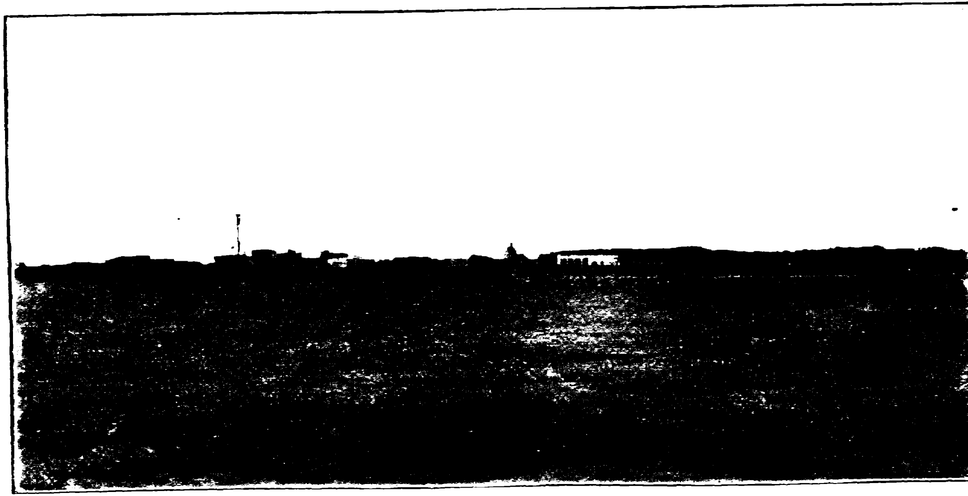
সমুদ্র।

রেলষ্টেশন হইতেই সমুদ্রের ভীষণ গর্জন শ্রুতিগোচর হয়। বর্ষাকালেই গর্জন প্রকোপ কিছু অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। স্বচ্ছ নীলাম্বুরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে দেখিতে অতি সুন্দর; তাহার মাঝে মাঝে দুই একখানি বিশালকায় পোত গমনাগমন করিয়া থাকে, এবং আমদানি রপ্তানি কার্য্যের জন্য তীর হইতে প্রায় দেড় মাইল ব্যবধানে উহা নোঙ্গর করিয়া থাকে। বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত সমুদ্র এরূপ ভীষণ উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল হয় যে সে সময় আমদানি, রপ্তানির কার্য্য অবাধে সম্পন্ন হইতে পারে না। সমুদ্রের বায়ু অতি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যকর। সাহেবেরা পুরীকে Brighton of Bengal বলেন। লবণাম্বু সমুদ্রে অবগাহন স্বাস্থ্যের পক্ষে যারপর নাই অনুকূল। গভীর' জলে গমন করিয়া স্নান করা উচিত নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার Sinclair Murray কোং'র একজন সাহেব জলমগ্ন হইয়াছিলেন। অপার সমুদ্র হইতে সূর্য্যের উদয় ও তন্মধ্যে অস্তগমন দেখিতে অতি মনোরম। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে তীর্থরাজ সমুদ্রের জলে স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয়। পুরুযোত্তমের সমুদ্র সকল তীর্থের প্রধান এবং ঐ তীর্থরাজ সলিলে স্নান করিয়া নারায়ণকে পূজা করিলে সর্ব্ব তীর্থের ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন সমুদ্রে স্নান করে, যমকিঙ্করগণ তাহাকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকে। অন্যান্য নদী অপেক্ষা নর্ম্মদা সমধিক পুণ্যদায়িকা, নর্ম্মদা অপেক্ষা গোদাবরী শতগুণ ও রেবানদী তদপেক্ষাও শতগুণ অধিক ফলজনক, কিন্তু সাগরজলে স্নান উক্ত রেবা অপেক্ষাও সহস্রগুণ অধিক পুণ্য প্রদান করিয়া থাকে। জ্যোৎস্না-স্নাত মধুর যামিনী যোগে সমুদ্রের সৌন্দর্য্য অতি মনোহর!

সমুদ্রে নানাবিধ জলজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়; কখনও কখনও সর্পও দেখা যায়। সাপ সকল সন্তরণ নিপুণ। নুলিয়া (জেলেগণ) সর্ব্বদাই জলযোগে মৎস্য ধরিয়া থাকে। জেলিমাছ, "ম-ধু-র" মাছ, খণ্ডবালিয়া (চেলা), শারণ (শঙ্কর) মাছ যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দেবদাসী।

জগন্নাথদেবের ভোগের সময় এবং অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তন করিবার



সমুদ্র।

জন্য মন্দিরে ১২০ জন নর্ত্তকী নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদিগকে দেবদাসী বলা হয়। কথিত আছে উৎকল রাজ একদা জগন্নাথদেবের গাত্রদেশ ধূলাধূসরিত দর্শন করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অনন্তর রাত্রে জগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশ হয় যে অমুক স্থানে বার্ত্তাকুক্ষেত্রে এক মালিনী গীতগোবিন্দ গান করিতেছিল আমি তাহা শুনিতে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে উৎকলরাজ সেই মালিনীকে আনাইয়া জগন্নাথদেবের সম্মুখে মধুর গীতগোবিন্দ গানে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তদবধি সেই মালিনীর বংশীয়গণই শ্রীমন্দিরে সঙ্গীত আলাপনের জন্য নিযুক্ত থাকিতেন। ইহা ভিন্ন কোনও কামনা করিয়া পিতামাতা নিজ কন্যাকে দেবতা উদ্দেশে জগন্নাথপদে উৎসর্গ করিতেন, স্থির যৌবন শ্রীকৃষ্ণ উৎসৃষ্টা কন্যার স্বামী, অন্য কোনও নবযুবক তাহার পাণিগ্রহণ করিতে পারিত না। শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে নৃত্যগীতাদির বিকাশ এবং পবিত্রভাবে জীবন যাপন করা দেবদাসীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যখন ভারতবর্ষে ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল তখন দেবদাসীগণ বারমুখী ছিল না এবং তাহাদিগকে কেহ বিলাসের বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারিত না। তাহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া দেবপত্নী সদৃশ পবিত্রভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত এবং সকলেই তাহাদিগকে দেবপত্নী সম ভক্তি করিত। ইউরোপীয় রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত খৃষ্টীয়ানদিগের মধ্যে আমাদের দেবদাসী নিয়োগ পদ্ধতির মত "নন্" নিয়োগ পদ্ধতি আছে। দাক্ষিণাত্যে ও আসাম অঞ্চলে ও দেবদাসী আছে। কালপ্রভাবে বহু দেবদাসী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত হইতে স্খলিত হইয়াছে, সেইজন্য সাধারণ লোক পূর্ব্বের মত তাহাদিগকে আর সেরূপ ভক্তির চক্ষে দেখে না। দেবদাসীগণকে উড়িষ্যাবাসীগণ "মাহুরী" বলে।

মহাদীপ।

প্রতি একাদশীর রাত্রে ভোগের শেষে জগন্নাথের মন্দিরের শিখরদেশে চক্রের নিম্নে এবং ভোগমন্দির ও নাটমন্দিরের চূড়ায় তিনটী আলো দেওয়া হয়, তাহাকে মহাদীপ কহে। নাটমন্দিরে সহজে উঠিবার সুবিধা আছে এবং সেখান হইতে একটী লোহার শৃঙ্খল সাহায্যে মন্দিরের শিখরদেশে আরোহণ করিতে পারা যায়। দীপদানের সময় চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইতে থাকে।

মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ।

খৃষ্টান, মুসলমান, পার্ব্বত্য জাতি, বাউরী, শবর, পান (মুচি) হাড়ী, চামার, ডোম, চণ্ডাল, নিষাদ, ধীবর, শুঁড়ী, কুলিয়া,কাণ্ড্রা, সাধারণ বারবনিতা, রজক, ও কুম্ভকার, ইহাদের মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগে গমন করিয়া দেব দর্শনের অধিকার নাই। কেবল শেষোক্ত জাতিদ্বয় মন্দিরের বহিপ্রাঙ্গনে গমন করিতে পারে। এই সকল জাতির জন্য সিংহদ্বারের ভিতর দক্ষিণদিকে পতিতপাবন জগন্নাথ মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। দুঃখের বিষয় কলিকাতা হইতে প্রকাশ্য বেশ্যাগণ আসিয়া জগন্নাথ দর্শন করিয়া থাকে। কথিত আছে চৈতন্যদেব উল্লিখিত জাতি সকলের জন্য ঐ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন পুরীর কোন রাজা কোনও গুরুতর কারণ বশতঃ পতিত হইয়া পণ্ডিতগণের নিকট ব্যবস্থা লইয়া ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মনিব্যাগ বা কোনও চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্য সঙ্গে লইয়া মন্দির অভ্যন্তরে গমন করা নিষিদ্ধ। উক্ত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে যথোচিত দণ্ডিত হইতে হয়।

পুরীর পঞ্চতীর্থ।

চক্রতীর্থ, স্বর্গদ্বার, শ্বেতগঙ্গা, মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর এই পাঁচটী তীর্থ পুরীর পঞ্চতীর্থ। কিন্তু পাণ্ডাগণ নিম্নলিখিত শ্লোকটী সর্ব্বদা বলেন:—

মার্কণ্ডেয়াবটে কৃষ্ণে রোহিনেয়ে মহাদধৌ।
ইন্দ্রদ্যুম্নে নরঃ স্নাত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

এই শ্লোক অনুসারে মার্কণ্ডেয় অবটে, অর্থাৎ মার্কণ্ডেয় সরোবরে, অকৃষ্ণে অর্থাৎ শ্বেতগঙ্গায়, রোহিণেয়ে অর্থাৎ রোহিনীকুণ্ডে, মহা সমুদ্রে ও ইন্দ্রদ্যুম্নে এই পাঁচটী তীর্থে স্নান করিলে নরের পুনর্জন্ম হয় না।

চক্রতীর্থ।

পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে শ্রীমন্দির হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে বালগুণ্ডি নালার (বাঁকা মোহনা) তীরে চক্রতীর্থ অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে এই নালায় স্থানে স্থানে জল পূর্ণ থাকে। প্রবাদ এই যে এই স্থানেই দারুব্রহ্ম ভাসিয়া আসিয়াছিলেন। বালুকা স্তূপের উপর একটী মন্দিরে শ্রীচক্র নারায়ণ মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। অদূরে আর একটী মন্দিরে শৃঙ্খলবদ্ধ হনুমান (বেড়ী হনুমান) মূর্ত্তি আছেন। কথিত আছে, জগন্নাথদেব সমুদ্র যাহাতে

অগ্রসর হইতে না পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার জন্য হনুমানকে ঐ স্থানে প্রহরী স্বরূপ বিদ্যমান থাকিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু হনুমান লাড্ডু খাইবার প্রলোভন দমন করিতে না পারিয়া প্রভুর ঐ কার্য্যে অবহেলা করতঃ অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলেন, তাহাতেই জগন্নাথদেব ক্রুদ্ধ অবস্থায় হনুমানকে আনাইয়া ঐ স্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখিয়াছেন। এই হনুমানকে লোকে 'দরিয়া মহাবীর' বলে। চক্রতীর্থ একটী সুমিষ্ট জলপূর্ণ পুষ্করিণী।

স্বর্গদ্বার।

ব্রহ্মা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনা অনুসারে দেবগণকে সঙ্গে লইয়া এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অবতরণ স্থানে একখণ্ড প্রস্তর প্রোথিত আছে। তাহাকে "স্বর্গদ্বার সাক্ষী" বলে। এখানে একটী মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। অধিকাংশ তীর্থ যাত্রী এখানেই সমুদ্র-স্নান করেন।

স্বর্গদ্বারের সমীপবর্ত্তী স্থানের দর্শন যোগ্য দৃশ্যাবলির তালিকা নিম্নে বিবৃত হইল।

"স্বর্গকু সমান সেই স্থান
স্বর্গদ্বার তঁহি নাম।" দারুব্রহ্ম।

১। **কাণপাতা হনুমান**—সুভদ্রাদেবী সমুদ্র গর্জনে ভীত হইয়া জগন্নাথদেবের শরণাপন্ন হইলে, জগন্নাথদেব হনুমানকে এই স্থানে থাকিতে বলেন। হনুমান সমুদ্রের গর্জন শ্রবণ করিবার জন্য কাণপাতিয়া অবহিত আছেন এবং সমুদ্র যাহাতে আর অগ্রসর হইতে না পারেন সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেছেন। তদনুসারেই প্রস্তাবিত হনূমান ঐ নামে অভিহিত। কথিত আছে যে সমুদ্রের ভীষণ শব্দে সুভদ্রার হস্তপদ উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

২। **অগস্ত্য মুনি**—সমুদ্র অগ্রসর হইলে তাহাকে গণ্ডুষে পান করিয়া ফেলিবেন বলিয়া অগস্ত্য মুনি সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট আছেন।

৩। **হরিদাস মঠ**—উড়িষ্যায় অনেক মঠ আছে। চৈতন্যদেব ভক্তগণের সাহায্যে এই স্থানে হরিদাসকে সমাহিত করেন। এখানে হরিদাসের একটী প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

৪। **বিদুরাশ্রম বা মুলুকদাস বাবাজীর মঠ**—এখানে তণ্ডুল কণান্ন ও ভার্জ্জিত শাক বিতরিত হয়।

৫। **নানক পন্থী মঠ**—কথিত আছে শ্মশ্রুমণ্ডিত গুরু নানকক্কে যবনভ্রমে পাণ্ডাগণ শ্রীমন্দির হইতে নিষ্কাষিত করিয়া দিলে, তিনি এই স্থানে বসিয়া জগন্নাথদেবকে স্তবদ্বারা তুষ্ট করেন। তাহাতে জগন্নাথদেব সেইখানেই পাতালভেদ করিয়া গুপ্তগঙ্গা আনিয়া দেন। গুপ্তগঙ্গা কূপে অষ্টবিংশ সংখ্যক প্রস্তরময় ধাপ বিদ্যমান আছে। যাত্রীগণ তাহাতে অবতরণ করিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া থাকে। ইহাকে "ভাসুর ভাদ্রবধূ" কূপ ও বলা হয়, কারণ ইহা এমনই ভাবে নির্ম্মিত যে ভাসুর ও ভাদ্রবধূ উভয়ে দুইদিক হইতে জল তুলিলে কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না। পঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের পিতা রাজা মহাসিংহ পুরীদর্শনে আসিয়া এই বাপীর কপাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এই মঠে শিখ অতিথিগণ বাস করেন।

৬। **কবির পন্থি মঠ**—এখানে কবিরের কাষ্ঠ পাদুকা ও জপমালা আছে। যাত্রীগণকে এখানে আমানি প্রসাদ দেওয়া হয়।

৭। **শঙ্কর মঠ**—ঋগ্বেদ প্রচারের জন্য শঙ্করাচার্য্য পুরুষোত্তমে গোবর্দ্ধন নামে মঠ স্থাপন করেন। পদ্মপাদ এই মঠের প্রথম আচার্য্য। গোবর্দ্ধন মঠের আচার্য্যকে তীর্থস্বামী নামে অভিহিত করা হয়। বালুসাহিতে অবস্থিত বলিয়া ইহার অপর নাম বালিমঠ। এখানে শঙ্করাচার্য্যের যৌবনাবস্থার একটী প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে। মঠে প্রত্যহ বেদ পাঠ হয়। উহার প্রতিষ্ঠার পরে তন্মধ্যস্থিত স্বামীদিগের হস্তে জগন্নাথ মন্দিরের তত্ত্বাবধান ভার ন্যস্ত ছিল। বর্ত্তমান ভোগমণ্ডপ মন্দিরের যে অংশে আছে সেই অংশে আদি শঙ্কর মঠ ছিল। রামানুজ মত প্রবল হওয়ায় শঙ্কর মঠ সমুদ্রতীরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। রামানুজ ও চৈতন্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ৭৫২টী মঠ পুরীতে আছে। শঙ্কর মঠই পুরীর আদি প্রতিষ্ঠিত মঠ।

৮। **গোপীনাথের তোটা**—তোটা শব্দের অর্থ বাগান। চৈতন্য-দেবের আদেশ মতে তাঁহার সখা গদাধর পুরুষোত্তমে গোপীনাথ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। কথিত আছে একদিন অপরাহ্ন সময়ে ভাবোন্মত্ত গৌরাঙ্গদেব গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন আর বাহির হইয়া আসেন নাই। ফল কথা গোপীনাথ মন্দিরে প্রবেশ করার পরে গৌরাঙ্গ-দেবকে কেহ আর দেখিতে পায় নাই। ভক্তগণ বলেন গোপীনাথের অঙ্গে

তিনি লীন হইয়া যান। গোপীনাথের অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ এবং গৌরাঙ্গদেবের অঙ্গ গৌরবর্ণ। গোপীনাথের উরুদেশে যে শ্বেত চিহ্ন বর্ত্তমান আছে তাহাই গৌরাঙ্গদেবের অঙ্গ চিহ্ন বলিয়া ভক্তগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

৯। **সিদ্ধ বকুল**—স্বর্গদ্বার হইতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে যাইবার পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী সঙ্কীর্ণ পথের ভিতর একটী মঠের মধ্যে এই বকুল গাছটি বিদ্যমান আছে। বৃক্ষটি আয়তনে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ইহা সম্পূর্ণ শূন্য গর্ভ, কেবল ত্বক মাত্র দ্বারা বাহিরে আচ্ছাদিত পত্রগুচ্ছ পূর্ণ এই সতেজ বৃক্ষটী শায়িত অবস্থায় রহিয়াছে। কথিত আছে চৈতন্যদেব মঠের সন্ন্যাসীগণকে দিবাকরের খরতাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটি বকুলের দাঁতন প্রোথিত করেন। তাহা হইতেই এই বৃক্ষটির উৎপত্তি। অত্রত্য জনগণের ধারণা এই যে এক বৎসর রথ নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠের অভাব হওয়ায় পুরীর রাজা এই বৃক্ষটি ছেদন করিতে আদেশ দেন, কিন্তু সূত্রধরগণ প্রাতঃকালে যথাস্থানে গমন করিয়া দেখিতে পায় রজনীযোগেই বৃক্ষটি শূন্য-গর্ভ অবস্থায় শায়িত হইয়াছে।

১০। **রাধাকান্ত মঠ**—সিদ্ধ বকুলের গলি হইতে মন্দিরে আসিবার পথের দক্ষিণ পার্শ্বে এই মঠ অবস্থিত। এইস্থানে উৎকল রাজের ইষ্টদেব ৺কাশীমিশ্রের বাটিতে চৈতন্যদেব অবস্থিতি করিতেন। এখানে চৈতন্য গাম্ভীরায় তাঁহার কাঁথার টুকরা, কাষ্ঠপাদুকা ও কমণ্ডলু আজও যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। ইহা বৈষ্ণবগণের পরম পবিত্র স্থান। মঠের দ্বারদেশে শ্বেতপ্রস্তরে "রাধাকান্ত মঠ, ৺কাশীমিশ্রের বাটী" লিখিত আছে। এই মঠ কোন্ সময়ে সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিতে পারা যায় না। কথিত আছে রাজা প্রতাপরুদ্র কাঞ্চিরাজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বপ্নে দেখিতে পান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন "তুমি যুদ্ধে জয়ী হইবে, আমার রাধাকান্ত মূর্ত্তি মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত আছে, প্রতিষ্ঠিত করিও"। তিনি এই মূর্ত্তি কুলগুরু কাশীমিশ্রকে দেন। রাধাকান্ত দেবের পূজাকার্য্য নির্ব্বাহার্থে মাদ্রাজ ও কটকে অনেক ভূসম্পত্তি আছে। এই মঠের অধীনে গঞ্জাম জেলার ৮টী, পুরীজেলার ৪টী ও বৃন্দাবনে তিনটী মঠ আছে।

শ্বেত-গঙ্গা।

রাধাকান্ত মঠ হইতে মন্দিরে যাইবার পথে বামদিকে গলির ভিতর এই সরোবর অবস্থিত। এখান হইতে মন্দির ৩।৪ মিনিটের পথ। ইহার জল অত্যন্ত অপরিষ্কার বলিয়া পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে, কাহাকেও উহার জলে স্নান করিতে দেওয়া হয় না। যাত্রীগণ তাহার জল স্পর্শ করেন মাত্র।

উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে ত্রেতাযুগে শ্বেত নামে এক রাজা ছিলেন তিনি জগন্নাথদেবের পরম ভক্ত ছিলেন এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা প্রবর্ত্তিত মহাভোগের প্রণালী অনুসারে প্রত্যহ ষড়বিধ ভোজ্যাদি ভোগের ব্যবস্থা করিতেন। একদিন প্রাতঃকালে শ্বেতরাজা জগন্নাথদেবের পূজার সময় উপস্থিত থাকিয়া সম্মুখে দেবগণ প্রদত্ত সহস্র সহস্র মনোরম উপহার রাজি দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, দেবগণ দিব্য উপহার নিচয় দ্বারা যাঁহার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হন না সেই হরি কি আমার মত মনুষ্যদত্ত ভোগ্য বস্তু সকল গ্রহণ করেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা জগন্নাথদেবকে প্রণাম ও স্তব করিয়া দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দেখিতে পাইলেন যে কমলাদেবী তাঁহারই প্রদত্ত ষড়রস পূর্ণ অন্নাদি জগন্নাথদেবকে পরিবেশন করিতেছেন এবং ভগবানের প্রতিমূর্ত্তিগণ চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া তাহা ভোজন করিতেছেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া নৃপতি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। শ্বেতরাজা অনেকদিন ধরিয়া তথায় তপস্যা নিমগ্ন ছিলেন পরে জগন্নাথদেব তাহাতে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন যে অক্ষয়বট ও সাগরের মধ্যবর্ত্তী মুক্তিক্ষেত্রে তুমি আমার আদি অবতার মূর্ত্তি মৎস্যরূপী বিষ্ণুর সম্মুখে শ্বেত মাধব নামে বিখ্যাত হইবে। শ্বেত মাধবের নামানুসারে এই সরোবরের নাম শ্বেত গঙ্গা হইয়াছে। এখানে শ্বেত মাধব ও মৎস্যমাধব মূর্ত্তি বিদ্যমান আছেন। সরোবরের তীরে ক্ষুদ্র মন্দির-গাত্রে দিব্য নবগ্রহ মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে।

গঙ্গামাতা মঠ।

শ্বেতগঙ্গাতীরে অবস্থিত। চৈতন্যদেব এখানে ভাগবৎ ও বেদান্ত শ্রবণ করিতেন। মঠে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

মার্কণ্ডেয় হ্রদ।

শ্রীমন্দিরের পশ্চিমে একটী সংকীর্ণ পথের পার্শ্বে অবস্থিত। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে প্রলয়কালে সপ্তকল্পজীবী মার্কণ্ডেয় মুনি প্রলয় জলে ভ্রমণ করিতে করিতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে একটী বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন; অনন্তর তৎসমীপস্থ একটী বালককে "আমার নিকট এস" ইহা কহিতে শুনিতে পাইলেন। এই কথা কোথা হইতে আসিতেছে চিন্তা করিতে করিতে নারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবীকে সহসা দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তাঁহাদের স্তব করিয়া যাহাতে দুস্তর সংসার সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারেন তাহার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। নারায়ণ তাঁহাকে কহিলেন বটবৃক্ষের ঊর্দ্ধদেশে পত্র-পুটকে যে বালক শয়ন করিয়া আছেন তাঁহাকে তুমি দর্শন কর তাঁহার বিস্তৃত বদনে তুমি অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। মার্কণ্ডেয় নারায়ণের আদেশানুসারে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া বালকের মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাঁহার মহোদরে চতুর্দ্দশ ভুবন, নদী, পর্ব্বত এবং ব্রহ্মাসৃষ্ট যাবতীয় বস্তু অবস্থিত রহিয়াছে। অনন্তর তিনি তাঁহার কুক্ষি দেশ হইতে নির্গত হইয়া পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া বলিলেন মহাপ্রলয়কালে নিখিল সৃষ্টি যে আপনার কুক্ষি প্রদেশে অবস্থিতি করে তাহা কি প্রকারে অবগত হইব? ভগবান বলিলেন এই ক্ষেত্র নিত্য, ইহাতে প্রলয় নাই, আমি এই মুক্তি-সাধক ক্ষেত্রে মহা প্রলয় পর্য্যন্ত স্থিতি করিব এবং মহাপ্রলয়াবসানে তোমার নিমিত্ত একটী নিত্যতীর্থ রচনা করিব। তুমি তাহার তীরে তপস্যা করিয়া আমার অন্য তনু শিবকে আরাধনা করিলে মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হইবে। মার্কণ্ডেয় মুনি বটবৃক্ষের বায়ুকোণে "মার্কণ্ডেয় খাত" বা "হরির খাত" প্রস্তুত করিয়া মহাদেবকে পূজা করিয়া মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন।

হ্রদের তীরে পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয় বট বিদ্যমান ছিল। এখানে মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেব, মৃত্যুঞ্জয় লিঙ্গ, পঞ্চপাণ্ডব লিঙ্গ ও কালীয় দমন প্রভৃতি মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমীতে এখানে কালীয়দমন যাত্রা হইয়া থাকে।

নরেন্দ্র সরোবর।

বড়দাণ্ড অবলম্বন করিয়া বরাবর গমন করিলে উত্তরদিকে পুরীরোড

দেখিতে পাওয়া যায়; পুরীরোড ধরিয়া একটু গমন করিলেই প্রস্তর সোপান বেষ্টিত বিশাল সরোবর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহার মধ্যস্থলে জগন্নাথ-দেবের চন্দন যাত্রার জন্য মঞ্চোপরি তিনটী ক্ষুদ্রায়তনের মন্দির আছে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জগন্নাথদেবের ভোগমূর্ত্তি এখানে আনীত হইয়া থাকেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লাকপোসী নরেন্দ্র নামক পুরীরাজের একজন কর্ম্মচারীর ব্যয়ে এই সরোবর খনন করা হইয়াছিল। এই সরোবরে অনেক প্রকাণ্ড কুম্ভীর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা সময়ে সময়ে সহসা মানুষকে ধৃত করিয়া একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলে। সুবিখ্যাত ন্যাংটা বাবাজী ভুতানন্দ স্বামীজি এই সরোবরে কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় চন্দন যাত্রায় 'মৌজের' সময় অসংখ্য লোক জলে অবগাহন ও সন্তরণ করে, কিন্তু সে সময় যে কেহ কখনও কোন কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে ইহা শুনা যায় নাই।

জগন্নাথ বল্লভ।

নরেন্দ্র সরোবর তীরে জগন্নাথদেবের একটী সুবিস্তৃত ফল ফুলে সুশোভিত উদ্যান আছে। তাহার নাম জগন্নাথ বল্লভ। কথিত আছে একদা পুরীর কোনও রাজা পাশ ক্রীড়ায় মগ্ন অবস্থায় পাণ্ডা কর্ত্তৃক প্রদত্ত মহাপ্রসাদ বাম করে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন, পরে সেই কার্য্যটী অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া হস্ত ছেদন করিয়া ফেলেন। ভক্তবৎসল জগন্নাথদেব ভক্তের নূতন হস্ত সৃজন করিয়া কর্ত্তিত হস্ত গোপাল বল্লভ উদ্যানে প্রোথিত করিতে বলেন। তাহা হইতে 'দোনা বৃক্ষ' জন্মিয়াছিল। দোনা ভরিয়া নবনী ভক্ষণ করিবার ইচ্ছায় একদা জগন্নাথদেব ছদ্মবেশে উদ্যানে দোনা চুরি করেন। উদ্যান রক্ষক চোর ধরিবার জন্য প্রস্তুত থাকিলে জগন্নাথদেব দোনা হস্তে দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন। পাণ্ডাগণ রত্নবেদীর উপর দোনা দর্শন করিয়া ইহা প্রভুর কার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারেন। তদবধি "দোনা চুরি" পর্ব্বের প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

রামানন্দরায় জগন্নাথ বল্লভ মঠের স্থাপয়িতা। বর্ত্তমান সময়ে এখানে কোনও মোহান্ত নাই, জজ সাহেব কর্ত্তৃক নিয়োজিত একটী Endowment Committee দ্বারা ইহার কার্য্য পরিচালিত হয়।

গুণ্ডিচা মন্দির।

মন্দির হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে বড়দাণ্ডের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। এই স্থানটীকে সুন্দরাচল বলে। কথিত আছে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার পাটরাণী গুণ্ডিচাদেবীর নামানুসারে এই স্থানের নাম গুণ্ডিচা বা (গুণ্ডিচা গড়) বা গুণ্ডাবাটী হইয়াছে। *

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা কৌমাগ্ন রাজার কন্যা মালাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। গুণ্ডিচা নাম কোথাও পাওয়া যায় না। গুণ্ডিচা মন্দির একটী বিস্তৃত প্রাঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত এবং ইহার দুইটী দ্বারের একটীর নাম সিংহ দ্বার ও অপরটীর নাম বিজয় দ্বার। এই মন্দিরেই ইন্দ্রদ্যুম্নের সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের মহাবেদীতে ভগবান আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য এই স্থানের অপর নাম জনকপুর। ভগবানের দারুমূর্ত্তি চতুষ্টয় এই স্থান হইতে রথে আরোহণ করাইয়া মন্দিরে লইয়া যাইয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল।

চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে এবং মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে গুণ্ডিচা মহোৎসব হইয়া থাকে। রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেব গুণ্ডিচা মন্দিরে আগমন করিয়া তথায় সাত দিন পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। অনন্তর পুনর্যাত্রার দিনে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কথিত আছে যে গুণ্ডিচাদেবী রথ যাত্রার সময় জগন্নাথ-দেবকে এখানে আনয়ন করিতেন বলিয়া আজিও সেই নিয়ম রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।

গুণ্ডিচা মন্দিরের অনতিদূরে একটা সঙ্কীর্ণ পথের পার্শ্বদেশে অবস্থিত। ইহা প্রস্তর সোপান বেষ্টিত একটী সুবৃহৎ সরোবর। মহাভারতীয় আরণ্যক পর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয় সমস্যা প্রসঙ্গে উহার উল্লেখ আছে। উৎকলখণ্ডের মতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নর অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গভূত গোদান ব্যাপার উপলক্ষে গো

---

* L. S. S. O'malley I. C. S. সাহেব বলেন—

"It may be connected with *Gundicha Musa*, a tree rat, *i.e.*, the squirrel and *Gundicha Pratipada*, the stick festival of the Deccan, and may thus signify the Log House."

সকলের ক্ষুর দ্বারা যে সকল গর্ত্ত হইয়াছিল তাহাই দান কালীন হস্তচ্যুত জল সমূহে এবং তাহাদের মূত্র ফেণে পূর্ণ হওয়ায় এই তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই তীর্থে স্নান ও তর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। ভূমণ্ডলে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তীর্থ আর নাই। ইহাতে অনেক কূর্ম্ম আছে। কথিত আছে যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আপনার বংশ ও কীর্ত্তি লোপ হইবার আশঙ্কায় তাহা রক্ষার জন্য জগন্নাথদেবের সকাশে বর প্রার্থনা করায় তিনি উক্ত সরোবরে তাঁহার বংশধরগণকে কূর্ম্মরূপে বিরাজমান থাকার আদেশ প্রদান করেন। উহার তীরে নৃসিংহ ও নীলকণ্ঠের মন্দির আছে।

লোকনাথ।

শ্রীমন্দির হইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটী সুবিস্তৃত উদ্যান মধ্যে অবস্থিত। লোকনাথ অনাদি শিবলিঙ্গ প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত একটী মন্দিরের মধ্যে জলে নিমগ্ন অবস্থায় আছেন। লোকনাথ লিঙ্গের দুই পার্শ্বে দুইটী সুবর্ণ নির্ম্মিত সর্প জীবন্ত সর্পের ন্যায় চক্র ধারণ করিয়া বিরাজমান। শিবরাত্রি উপলক্ষে জল সিঞ্চন করিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া পূজা করা হয়। সাধারণতঃ লোকে প্রকৃত লোকনাথ লিঙ্গের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয় না। লোকনাথের প্রতিনিধিরূপে লোকনাথ মূর্ত্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। তাহার কতকাংশ জলে নিমজ্জিত অবস্থায় আছে।

কথিত আছে যে রামচন্দ্র সীতা অন্বেষণে লঙ্কায় গমন করিবার সময়ে এখানে আসিয়া অন্য শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত না হইয়া শবরদিগের প্রদত্ত "লাউ" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া এই লিঙ্গের নাম লাউকানাথ বা লোকনাথ হইয়াছে। এই মন্দিরের পার্শ্বে হরপার্ব্বতী মন্দির বিদ্যমান আছে।

চান্দ্র বৈশাখের শেষ সোমবারে এখানে একটী প্রদর্শনী হইয়া থাকে। এই দিনকে 'সরস্তি সোমবার' বলে। এই উপলক্ষে বিস্তর লোকের সমাগম হয়।

উড়িষ্যাবাসীগণ লোকনাথ লিঙ্গকে যেরূপ ভয় করে, জগন্নাথদেবকে সেরূপ ভয় করেনা। তাহাদের ধারণায় লোকনাথের শপথ সকল শপথ অপেক্ষা সমধিক প্রভাবান। আমাদের দেশের তারকেশ্বরের মত এখানে অনেকে হত্যা দিয়া থাকে। এখানে যে পরিমাণে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ ভিক্ষুক দেখিতে

পাওয়া যায় সেরূপ আর কুত্রাপি নাই। শিবরাত্রির সময়ে উড়িষ্যার সকল স্থান হইতে বিস্তর লোক এখানে উপস্থিত হইয়া থাকে।

যমেশ্বর।

মন্দিরের আধ মাইল উত্তরে। যমভয় নিবারক বলিয়া উহা যমেশ্বর নামে খ্যাত। ইঁহার দর্শনে ও পূজায় কোটি শিবলিঙ্গের পূজার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অলাবুকেশ্বর।

যমেশ্বর লিঙ্গের পশ্চিমে। লিঙ্গটি দেখিতে "অলাবুর" ন্যায়। ইঁহার দর্শনে অপুত্রকের পুত্র লাভ হইয়া থাকে।

কপাল মোচন।

অলাবুকেশ্বরের নিকট। মহাদেব ক্রোধান্বিত হইয়া ব্রহ্মার পঞ্চম মুখচ্ছেদন করিয়া তাঁহার কপালখণ্ড এখানে রাখিয়াছিলেন। ইঁহাকে দর্শন, পূজা ও প্রণাম করিলে ব্রহ্ম হত্যা পাপের নাশ হইয়া থাকে। কাশীতেও এই নামের তীর্থস্থান আছে।

লক্ষ্মীর জলা।

পুরী হইতে ২ মাইল দূরে একটি বিস্তৃত মাঠ আছে, তাহাকে লক্ষ্মীর জলা বলে। ইহাতে যে ধান্য জন্মে তাহা হইতে উৎপন্ন তণ্ডুলে জগন্নাথদেবের ভোগ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

আলাল নাথ।

পুরীধাম হইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণে আলালনাথ নামে শিবলিঙ্গ বিরাজমান। চৈতন্যদেব অসংখ্যবার এখানে গমন করিয়াছিলেন।

চটক পর্ব্বত।

সিংহদ্বার হইতে যে পথ সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত, তাহার পশ্চিমদিকে একটি উচ্চ বালুকাস্তূপ দৃষ্ট হয়, উহাকে চটক পর্ব্বত কহে। ভক্তগণের চক্ষে উহা গোবর্দ্ধন গিরি।

পুরী মাহাত্ম্য ও দেব মাহাত্ম্য।

শ্রীক্ষেত্রধামে একদিন মাত্র বাস করিলে ব্রত, তীর্থ ও দানে যে ফল উক্ত

আছে তাহার সমুদয় লাভ হইয়া থাকে। নিমেষ মাত্র বাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। এস্থানে যে সকল পাষণ্ড ও পাপাচারী ব্যক্তি সমাগত হয়, তাহাদের পাপরাশি অগ্নিতে তুলারাশির ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায়। এই ক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে মুক্তিলাভ হয়। ভূমণ্ডলে এরূপ অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যপূরিত তীর্থস্থান আর কুত্রাপি নাই। ইহা পৃথিবীতে ভূস্বর্গ বলিয়া কথিত ও ইহা বিষ্ণুর কলেবর স্বরূপ। এস্থানে প্রত্যক্ষ দেহধারী জগন্নাথদেবকে অর্চ্চনা করিয়া মানব, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নীলাচলস্থিত দারুময় বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করে তাহার অন্য যজ্ঞ, তীর্থ, দান, বা তপস্যার প্রয়োজন নাই। একবৎসরকাল ৺পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করিলে সর্ব্বপুণ্য-ক্ষেত্র-নিবাসের মহাপুণ্যফললাভ সংঘটিত হইয়া থাকে। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের সমীপবর্ত্তী যে কোনও স্থানে কলেবর ত্যাগ হইলে মুক্তিলাভ হয়।

আটিকা বন্ধন।

উড়িষ্যাভাষায় আটিকা অর্থে ছোট হাঁড়ী বুঝায়। আটিকা, ভোগ রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাত্রীগণের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার সুদের আয় হইতে জগন্নাথদেবের ভোগ অর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়। ইহার নাম আটিকা বন্ধন। পূর্ব্বে আটিকা বন্ধন সম্বন্ধে তীর্থযাত্রীর উপর অত্যাচার হইত, কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপ হয় না। আটিকা সাধারণতঃ সাত প্রকার ঃ—

১ম।	৫৬০০৲ টাকা ; ইহাতে ৫৬ প্রকার খাদ্যাদিদ্বারা ভোগ দিতে হয়।					
২য়।	১৫৫০৲ টাকা	হইতে		মোহনভোগ	প্রদত্ত	হয়।
৩য়।	৭৫০৲ টাকা	”		মালপুয়া	”	” ।
৪র্থ।	৫৫০৲ টাকা	”		পুরী ও ক্ষীর	”	” ।
৫ম।	৪৩৪৲ টাকা	”	”	মসলাযুক্ত (খিচুড়ী) খেচরান্ন		
৬ষ্ঠ।	৩৬০৲ টাকা	”	”	সাদা	”	”
৭ম।	১৩২৲ টাকা	”	”	ডাল, ভাত	”	” ”

পাণ্ডাগণ ইহার কমেও, এমন কি ১০৲ টাকা ৫৲ টাকাতে ও আটিকা বন্ধন করাইয়া দিব বলিয়া সরলচিত্ত যাত্রীগণকে প্রতারিত করে। যাত্রীগণের

নিকট নগদ টাকা না থাকিলে তাহারা তাহাদের নিকট হইতে হাতচিঠা লিখাইয়া লইতেও কুণ্ঠিত হয় না। কতকগুলি পাণ্ডা বলেন যে তাঁহারা যাত্রী প্রদত্ত সমস্ত টাকা চাউল ডাল ইত্যাদি ক্রয় করিয়া একদিনেই ভোগ দেন এবং সেই ভোগ আনন্দ বাজারে বিক্রীত হইলে তাহা হইতে যে আয় হয় তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। স্মরণাতীতকাল হইতে আটকিয়া বন্ধন চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রীতিমত ভোগ দেওয়া হয় না। এই বিষয়ে একটি সুবন্দোবস্ত হওয়া উচিত।

মন্দিরের উত্তরদিকে হস্তীদ্বারের নিকট বৈকুণ্ঠ পুরী নামে যে দ্বিতল গৃহ আছে সেখানে আটিকা বন্ধন সম্পন্ন হয়। আটিকা বন্ধন সমাপনান্তে পাণ্ডাগণ তীর্থযাত্রীর ও তাঁহার উর্দ্ধতন চারিপুরুষের নাম ধাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইয়া থাকেন। থানা ও গ্রামের সূচীপত্র করিয়া এমনই সুন্দররূপে উহা লিখিত হইয়া থাকে যে তীর্থযাত্রীর কোনও উত্তরাধিকারী শত বৎসর পরেও তীর্থে পদার্পণ করিলে পাণ্ডা মহাশয়গণ ঠিক আপন আপন যাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া লইতে সমর্থ হন।

এখানে ১৪০০ ঘর পাণ্ডা আছেন। সময়ে সময়ে যাত্রী লইয়া পাণ্ডাগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। পাণ্ডাগণ তীর্থযাত্রী সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে তাঁহাদের গোমস্তা, বাটুয়া বা সেথো প্রেরণ করেন এবং ইঁহারা যাত্রীগণকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া বহুসংখ্যক যাত্রী সংগ্রহ করিয়া আসেন।

অশ্লীল প্রতিমূর্ত্তি।

নাটমন্দিরের গাত্রে স্ত্রীপুরুষঘটিত নানাবিধ প্রস্তর ক্ষোদিত সুবৃহত অশ্লীল প্রতিমূর্ত্তি আছে। বিশেষরূপে দেখিলে নাটমন্দিরের ও ভোগ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে এইরূপ ছোট ছোট অসংখ্য মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মূল মন্দিরের গায়ে ঐরূপ একটী মূর্ত্তিও নাই। দেবতা স্থলে এই সকল কুরুচি পূর্ণ মূর্ত্তি কেন রক্ষিত হইয়াছে তাহার সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া সুকঠিন।

কেহ কেহ এইরূপ দোষারোপ করেন যে ঐ সকল চিত্র মন্দির নির্ম্মাণ কালের অধিবাসীগণের কুরুচির পরিচায়ক। কিন্তু ঐরূপ মূর্ত্তি যে কেবল পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে, গুণ্ডিচা মন্দিরে, কোণার্কের সূর্য্যদেবের মন্দিরে

এবং ভুবনেশ্বরের অসংখ্য মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদিত আছে তাহা নহে, ভারতের অন্যান্য বহু স্থানেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গা ও গণ্ডক নদীর সঙ্গম স্থলে হরিহর ছত্রে হরিহর নাথের মন্দিরেও এইরূপ মূর্ত্তি আছে। দাক্ষিণাত্যের অনেক দেবমন্দিরে এইরূপ চিত্র বিদ্যমান আছে শুনিয়াছি। ইউরোপের অনেক Roman Catholic গির্জ্জায় ও এইরূপ মূর্ত্তি আছে বলিয়া শুনা যায়। পাণ্ডাগণ বলেন যে এই সকল মূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত এবং মন্দিরে বজ্রপাত প্রভৃতি ভয় নিবারণার্থ এই সকল প্রতিকৃতি মন্দির গাত্রে ক্ষোদিত আছে। তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ উৎকলখণ্ডের একবিংশ অধ্যায় হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

"বজ্রপাতাদি ভীত্যাদিবারনার্থং যথোদিতম।
শিল্পি শাস্ত্রেঽপি মণ্যাদি বিন্যাসং পৌরুষাকৃতিম ॥"

অগ্নিপুরাণে (১০৪ অধ্যায়)। "অধঃশাখা চতুর্থাংশে প্রতীহারৌ নিবেশয়েৎ
মিথুনৈরথ বল্লীভিঃ শাখাশেষং বিভূষয়েৎ ॥

বৃহৎ সংহিতায় (৫৭ অধ্যায়)।—"মিথুনৈঃ পত্র বল্লীভিঃ প্রমথৈ
শ্চোপশোভয়েৎ।"

তাঁহারা বলেন এই কারণেই গগণস্পর্শী ঐ মন্দিরে কখনও বজ্রপাত হয় নাই। অনেকে বলেন এই সকল মূর্ত্তি তান্ত্রিক মতে যোগ বিশেষের আসন ব্যঞ্জক। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে মন্দির গাত্রস্থ উল্লিখিত মূর্ত্তিগুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাত্রী হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভক্তি ও অভক্তির পরীক্ষায় নিকষ প্রস্তর। এই সকল তথাকথিত কুরুচিপূর্ণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রকৃত ভক্তগণের হৃদয়ে কোনওরূপ বিকারের সঞ্চার হয় না। কেবল যাহারা ভক্ত নহে তাহাদেরই মনে বিকার জন্মিতে পারে এবং তাহারাই দুর্দ্দম রিপু গ্রাসের বশীভূত হইয়া পুণ্য সঞ্চয় উদ্দেশে তথায় আগমন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পাপ সঞ্চয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। তীর্থস্থানে দেব-দেব জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে আসিয়া মন্দিরগাত্রে তথাকথিত কুরুচি-ব্যঞ্জক কতিপয় প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া যাহাদের মনে কুভাব সঞ্চারিত হয় তাহাদিগের পক্ষে তীর্থস্থানে না আসাই শ্রেয়স্কর। "দেহো দেবালয় প্রোক্ত", দেহের বাহিরে কামাদির নগ্নমূর্ত্তি বিরাজ করে, ভিতরে আত্মারাম বিরাজমান। দেবালয়ের বহির্দেশে

কামাদির বীভৎসমূর্ত্তি, ভিতরে পরমাত্মার বিগ্রহ। বাহিরের বীভৎসমূর্ত্তি দেখিয়া যাহাদের চিত্তবিকার জন্মে তাহারা ভিতরের দেবদর্শনে অধিকারী নহে। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এইরূপেই শিখান হয়। শ্রীমন্দিরের নিম্নস্তরে জীব প্রকৃতির নিম্নস্তরে যতপ্রকার কুৎসিতভাব লুক্কাইত থাকে তাহা দেখান হইয়াছে, কয়েকস্তর উপরে দেবদেবীর মূর্ত্তি, তদুপরি ভগবানের বিভিন্ন প্রকারের অবতার ও লীলাব্যঞ্জক মূর্ত্তি, সর্ব্বোপরি দেবাদিদেব জগন্নাথ মূর্ত্তি। কেহ কেহ বলেন বৌদ্ধগণের মন্দির প্রবেশ এক কালে রহিত করিবার জন্য এই সকল অশ্লীলতা-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবার কোন ভাবুকের মত এই যে তথাকথিত কুরুচি-মাখা এই সকল চিত্রগুলি যেন তারস্বরে বলিতেছে, হে কাম-সর্ব্বস্ব পাপাসক্ত ব্যক্তিগণ, তোমরা যে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অযোগ্য তাহা মনে করিও না, মন্দিরের দেবতা জগন্নাথপ্রভু তাঁহার অনির্ব্বচনীয় প্রেমদ্বারা তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আত্মা কূটস্থ ও নিত্য নির্ব্বিকার, স্থূল দেহের পাপ পুণ্যাদি কখন তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, তদনুসারে মন্দিরের বহিস্থ অশ্লীল মূর্ত্তির সহিত মূল ওঁকার মূর্ত্তির কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই।

আলোক অভাব।

সুবৃহৎ মন্দির প্রাঙ্গনে বা মন্দিরের সম্মুখস্থ পথের উপর অন্ধকার রাত্রে আলোকের ব্যবস্থা নাই। তৎসম্বন্ধে পাণ্ডাগণ বলেন কোনও সময় মন্দিরের চত্বরের ভিতরে কোনও রাজার ব্যয়ে বিদ্যুৎ আলোকের বন্দোবস্ত করার পর পাণ্ডাদিগের গৃহে ভয়ানক বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। জগন্নাথ-দেবের প্রত্যাদেশ অনুসারে বিদ্যুৎ আলোক স্থানান্তরিত হইলে আর কাহারও সে পীড়া হয় নাই। মন্দিরের ভিতরে মাত্র দুইটী ঘৃত প্রদীপ এবং পুনাগতৈলের মসাল প্রজ্বলিত করিয়া রাখা হয়। সেইজন্য বাহিরের আলোক হইতে মন্দিরা-ভ্যন্তরে যাইয়া প্রথমে তীর্থযাত্রীগণ শ্রীমূর্ত্তি ভালরূপ দেখিতে পান না।

তীর্থের নিদর্শন।

বিহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলবাসী যাত্রীগণ রক্তরাগ রঞ্জিত বেত্রখণ্ড সকল লইয়া যায়। জগন্নাথদেব যে বেত্র প্রহার দ্বারা তাহাদের পাপ স্খলন

করিয়া দিয়াছেন বেত্রখণ্ড তাহারই নিদর্শন। অন্য দেশীয় যাত্রীগণ তিলকমাটী, আনন্দলাড্ডু, মহাপ্রসাদ, সমুদ্রের ফেনা ও ঝিনুক, পিতলের পাদপদ্মচিহ্ন, তুলসির মালা, জগন্নাথদেবের ভিন্ন ভিন্ন বেশের পটমূর্ত্তি প্রভৃতি এবং আত্মীয় স্বজনকে উপহার দিবার উদ্দেশে সুন্দর কাংসপাত্র, নানারকমের রেসমী কাপড় প্রভৃতি লইয়া যায়। তীর্থযাত্রীগণ পুরুষোত্তমে আসিয়া কোনও কোনও ফল জগন্নাথ-দেবকে অর্পণ করিয়া ভবিষ্যতে কখন আর তাহা নিজেরা ভোগ করিবে না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যায়। দেবাদিদেব জগন্নাথদেবকে ফল সমর্পণ করা অর্থে ভগবানকে সর্ব্বকর্ম্মফল সমর্পণ করা বুঝায়। পূর্ব্বে ভক্তগণ তীর্থে আসিয়া একটী ফল সমর্পণ করিয়া স্বীয় কর্ম্মফল ভগবানকে সমর্পণ করিয়া যাইত, এবং গৃহে প্রত্যাবর্ত্তণ করিয়া পুনরায় সংসার ব্যাপারে লিপ্ত হইত না। তীর্থযাত্রীগণ বর্ত্তমানকালে কিন্তু বাহ্যভাবে ফল সমর্পণ করিয়া যায় বটে কিন্তু তাহার প্রকৃত উদ্দেশমত কার্য্য অনুষ্ঠানে কখনই তৎপর নহে।

ধ্বজা।

বহু তীর্থযাত্রী গৃহে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে মন্দিরের শিখরদেশস্থ চক্রে ধ্বজা উড়াইয়া যান। তদুদ্দেশে রক্তবর্ণ বসনের পতাকা মন্দির চত্বরে বিক্রীত হইয়া থাকে। পাণ্ডাগণ ধ্বজা উড়াইবার ব্যয় স্বরূপ তীর্থযাত্রীগণের অবস্থামত পাঁচসিকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া ধ্বজা ও প্রদীপ দিবার জন্য চুনার জাতীয় কতকগুলি লোক নিয়োজিত আছে তাহারা পুরুষানুক্রমে মন্দির গাত্রে চুন দিবার কার্য্য করে এবং গরুড়-স্তম্ভের নিকট ঘৃত-প্রদীপ দেয়, যাত্রীগণকে ঘৃত প্রদীপ বিক্রয় করে এবং মন্দিরের চূড়াতে ধ্বজা ও প্রদীপ প্রদান করিয়া থাকে। এক্ষণে তাহাদের সংখ্যা ২০।২১ ঘরের অধিক নহে। তাহারা সামান্য চারি পাঁচ পয়সা পারি-শ্রমিক গ্রহণ করিয়া অনায়াসে অত্যুচ্চ মন্দির শিখরে আরোহণ করিয়া ধ্বজা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করে। তথা হইতে তাহাদের দ্রুত অবতরণ দেখিলে বিস্ময়-বিহ্বল হইতে হয়। প্রাঙ্গন হইতে নাট মন্দিরের উপর দিয়া মূল মন্দিরের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিবার পথ বেশ সুগম; সে স্থান হইতে শিখর দেশস্থ গম্বুজের নিম্ন পর্য্যন্ত মন্দির গাত্রের দুই পার্শ্বে পাতকুয়ার মত খাঁজ কাটা আছে। মন্দিরের দিকে পশ্চাৎ করিয়া সেই খাঁজ গুলিতে পা দিয়া

তাহারা গম্বুজ পর্য্যন্ত আরোহণ করে। চক্র হইতে গম্বুজের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত একটী লোহার শৃঙ্খল আছে। তদবলম্বন করিয়া চক্র পর্য্যন্ত আরোহণ করে। ইহারা এই কার্য্যে এরূপ অভ্যস্ত যে ইহাদের আরোহণ ও অবতরণ কার্য্য যেন নিমেষ মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া যায়। উহারা যখন শিখরদেশারূঢ় হয় তখন প্রাঙ্গণ হইতে উহাদিগকে অল্প বয়স্ক শিশুর ন্যায় দেখায়।

ধর্ম্মশালা ও চিকিৎসালয়।

নরেন্দ্র সরোবরের সন্নিকটে বাবু কানাইলাল পণ্ডিতের ধর্ম্মশালা ও বড়দাণ্ড রাস্তার উপর বাবু কানাইলাল বগলার ধর্ম্মশালা বিদ্যমান আছে। এই সকল ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিবার জন্য যাত্রীগণকে আহার্য্যব্যয় ব্যতীত থাকা সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যয়ভার বহন করিতে হয় না।

পুরীতে যাত্রীগণের জন্য একটী যাত্রী চিকিৎসালয়, একটী কলেরা রোগীর নিবাস প্রতিষ্ঠিত আছে। তদ্ব্যতীত মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে একটী দাতব্য ঔষধালয় ও আছে।

এখানে একটী কুষ্ঠাশ্রম আছে। কুমার রামেশ্বর মালিয়া কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসালয়ের জন্য দুই সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। নিঃস্ব রোগী ও যাত্রী-গণের পাথেয় ইত্যাদি ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ১৯০২ সাল হইতে একটী অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হইতে সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে।

পুরী লজিং হাউস আইন।

পর্ব্বোপলক্ষে পুরীতে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে এবং পাণ্ডাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে বহুসংখ্যক লোকের বাসস্থান দিয়া সহরের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইত। তৎপ্রতিকার মানসে পুরী লজিং হাউস আইন পাশ করিতে হইয়াছে। সেই আইন বলে লাইসেন্স ব্যতীত যাত্রী রাখিবার কোন অধিকার নাই; প্রত্যেক গৃহে কি পরিমাণ যাত্রী থাকিতে পাইবে তাহা গৃহের গাত্রদেশে লিখিত আছে। নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অপরাধীকে দণ্ডিত হইতে হয়। এই আইন পাশ হইবার পর হইতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পুরীর বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ন্যূনাধিক সহস্র লাইসেন্স-প্রাপ্ত গৃহ আছে, তাহাতে প্রায় ২৫ সহস্র যাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে। যাত্রী যাইবার পথে উলুবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে এই আইন প্রবর্ত্তিত ছিল।

মন্দিরের তত্ত্বাবধান।

১৮৪০ খৃঃঅব্দের ১০ আইন দ্বারা যাত্রীকর (Pilgrim Tax) রহিত করা হয় এবং শ্রীমন্দিরের তত্ত্বাবধান ভার খুর্দ্দার রাজার করে ন্যস্ত হয়। ১৮৪৩ সালের নভেম্বর মাসে ২৩৩২১৲ টাকা আয় বিশিষ্ট জগন্নাথ মন্দিরের যাবতীয় দেবোত্তর সম্পত্তি সাতইশ হাজারি মহল, দেবপূজাদির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৮৫৯ খৃঃঅব্দে খুর্দ্দার রাজার মৃত্যুর পরে তাঁহার কৃত উইলের সর্ত্ত অনুসারে তাঁহার স্ত্রী মন্দির সংক্রান্ত কার্য্যের ব্যবস্থা বিষয়ে অধিকারিণী হন, কিন্তু তদ্বিষয়ে কোনরূপ সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার পোষ্যপুত্র সাবালক হইয়া পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু ভাগ্য বিপর্য্যয়ে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে হত্যাপরাধে নির্ব্বাসিত হইতে হয়। বর্ত্তমান রাজা মুকুন্দদেবের নাবালক অবস্থায় তাঁহার পিতামহী তাঁহার অবিভাবক স্বরূপে মন্দিরের কার্য্যাদি পরিচালন করিতেন, পরে রাজা স্বয়ং সাবালক হইয়া মন্দির সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্বাবধান ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আশানুরূপ সুবন্দোবস্ত করিতে কৃতকার্য্য না হওয়ায় তাঁহার সম্মতি ক্রমে জগন্নাথদেবের সম্পত্তি মন্দিরের তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের এবং দেবপূজার সুচারু বন্দোবস্ত করিবার মানসে একজন উড়িষ্যা-বাসী সুদক্ষ ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অধীনে কতকগুলি Inspector, Overseer ও তত্ত্বাবধায়ক নিয়োজিত আছেন। তাঁহারা কতকগুলি পদাতিক ভৃত্যের সাহায্যে মন্দিরে পূজাদি কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

মন্দিরের আয়।

সরকার বাহাদুর জগন্নাথদেবের মন্দিরের নামে ৬৭২৫০ একার পরিমাণ জমী দান করিয়াছেন। এই জমীদারীর আয় ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইতেও প্রচুর অর্থের সংস্থান হইয়া থাকে। জগন্নাথদেবের তোষাখানায় নানাবিধ মূল্যবান বস্ত্র, শাল, গহনা, হীরা, মানিক এবং আসবাব আছে। কাশীর মহারাজ-প্রদত্ত জগন্নাথদেবের একটী অতিসুন্দর মখমলের উপরে জরির কার্য্যযুক্ত মূল্যবান তাম্বু আছে।

১। তীর্থযাত্রীগণ সুবর্ণ, রজত ও হীরক নির্ম্মিত অলঙ্কার, শাল জামেয়ার এবং রেসমী বসন আদি এবং নগত মুদ্রা উপহার দিয়া থাকেন। অলঙ্কার বস্ত্রাদি তোষাখানায় জমা রাখা হয়। *

২। মহাপ্রসাদ বিক্রয় লব্ধ আয়।

৩। সেবাইত নিয়োগের সময় নজর।

৪। জগন্নাথদেবের রথের কাষ্ঠ ও চিহ্নিত বস্ত্রাদি বিক্রয়ের আয়। এই সকল কাষ্ঠ ও বস্ত্রাদি পরম পবিত্র জ্ঞানে অনেকে বহু মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিয়া থাকেন।

৫। ধনশালী ব্যক্তিগণ বা তাঁহাদের মহিলাগণ জন সাধারণের সহিত দর্শন করিতে না চাহিলে, অল্পক্ষণের জন্য জনসাধারণকে মন্দির হইতে বাহিরে রাখিবার জন্য যে অর্থ প্রদান করেন।

৬। মহাপ্রসাদ প্রভৃতি বিক্রয় করিবার অধিকার দানের আয়।

৭। রৌহিণকুণ্ড ও গুণ্ডিচা মন্দিরে যাত্রীর নিকট হইতে পয়সা আদায়ের আয়।

৮। জগন্নাথের বেশ দর্শন প্রভৃতির জন্য লোক প্রতি চারি আনা হিসাবে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল আয় হইতে বৎসরে কুড়ি হাজার হইতে চল্লিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত সঞ্চিত হয়। উদ্বৃত্ত অর্থ মন্দির সংস্কারে ও তদানুসঙ্গিক অন্যান্য কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

মন্দির সংস্কার।

মন্দিরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল; অনন্তর কটকের ধর্ম্মপ্রাণ ও মহামান্য উকিল ৺রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুর ও সবজজ ৺বলরাম মল্লিক প্রমুখ সহোদয়গণ প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া মন্দিরের সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব।

বঙ্গ-গৌরব চৈতন্যদেবের জীবনীর কতক অংশ এতৎ প্রসঙ্গে বিবৃত না

---

* ১৮৩৯ খৃঃঅব্দে মহারাজা রণজিত সিংহ তাঁহার মৃত্যুশয্যায় কোহিনূর হীরক জগন্নাথদেবকে উপহার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুসারে কার্য্য হয় নাই।

করিলে পুরীর বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। চৈতন্যদেব জীবনের অধিকাংশ সময় পুরীধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের সময় সাক্ষীগোপাল কটকেই ছিলেন, পরে পুরীর অনতিদূরে সত্যবাদী নামক স্থানে স্থানান্তরিত হন।

গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়া কিছুকাল নবদ্বীপের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে হরিপ্রেমে মত্ত করিয়া পরে নিতাই, মুকুন্দ প্রভৃতি সঙ্গীগণকে লইয়া নীলাচল যাত্রা করিয়াছিলেন (১৫১০ খৃঃঅব্দে)। পথে জলেশ্বরে জলেশ্বর শিবলিঙ্গ পূজা, রেমুনাতে গোপীনাথ দর্শন, যাজপুরে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান ও বরাহ মূর্ত্তি দর্শন, কটকে মহানদীতে স্নান ও সাক্ষীগোপাল দর্শন, ভুবনেশ্বরে ভুবনেশ্বর দর্শন, বিন্দুহ্রদে স্নান ও কপিলেশ্বর দর্শন এবং আঠার নালা অতিক্রম করিয়া শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হন।

জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চৈতন্যদেব উন্মাদের ন্যায় জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইয়া অচেতন হইয়া পড়েন। উৎকল রাজের সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম * তখন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি সেই নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া মোহিত চিত্তে অচেতন অবস্থাতেই তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া যান। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য-প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্যদেব সঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে সমুদ্র-স্নান করিয়া সেদিন সার্ব্বভৌমের আবাসেই আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। সার্ব্বভৌম ও চৈতন্যের সঙ্গীগণ তাঁহাকে সর্ব্বদাই জগন্নাথ দর্শনে যাইতে দিতেন না। চৈতন্যদেব অতিগোপনে দেব দর্শনে গমন করিয়া একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। কিন্তু মূর্ত্তির নিকট অগ্রসর হইতে তাঁহার সাহস হইত না। গরুড়স্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া

---

* বাসুদেব সার্ব্বভৌমের জন্মস্থান নবদ্বীপ। ইনি মহেশ্বর বিশারদের পুত্র এবং মিথিলায় ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিতে যান। মিথিলার প্রাধান্য লোপ হইবার ভয়ে মৈথিলি পণ্ডিতগণ ন্যায় শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুঁথি অন্যত্র লইয়া যাইতে দিতেন না। বাসুদেব সমগ্র "তত্ত্ব চিন্তামনি" এবং "কুসুমাঞ্জলি" কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া আসিয়া বঙ্গদেশে প্রচারিত করেন। তিনি "সার্ব্বভৌম নিরুক্তি" নামক গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম নব্য ন্যায়ের আদিগুরু, রঘুনাথ শিরোমনি ইঁহার শিষ্য ছিলেন; উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র ইঁহাকে রাজপণ্ডিত পদে বরণ করিয়াছিলেন।

তিনি দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতেন। সার্ব্বভৌম নিজ মাতৃস্বসার আবাসে চৈতন্যদেব ও তাঁহার সঙ্গিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম অত্যন্ত দাম্ভিক ছিলেন এবং অল্প বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করায়, চৈতন্যদেবকে একটু বিদ্রুপ করিতেও ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু চৈতন্য বিনীতভাবে তাঁহাকে আপন গুরুদেবের ন্যায় সম্মান করিতেন। সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া চৈতন্যদেব প্রত্যহ তাঁহার বাটীতে বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিতে গমন করিতেন। একদিন সার্ব্বভৌম একটী শ্লোকের ৯টী বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া নিজ পাণ্ডিত্য অভিমান প্রকাশ করিলে চৈতন্যদেব সেই শ্লোকটীর উক্ত ৯টী ব্যাখ্যা ব্যতীত আরও ১৮টী উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করেন,তাহাতে সার্ব্বভৌম অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চৈতন্যদেবকে অসাধারণ মনুষ্য, এমন কি অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে সার্ব্বভৌম কখন মহাপ্রসাদ আহার করিতেন না। একদিন অতি প্রত্যুষে চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের আবাসে গমন করিয়া দেখিলেন যে তিনি তখনও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন নাই। চৈতন্যদেব তাঁহাকে জাগরিত করাইয়া তাঁহার হস্তে মহাপ্রসাদ অর্পণ করিলে সার্ব্বভৌম মুখ প্রক্ষালন ও স্নান আহ্নিক সম্পন্ন না করিয়াই প্রসন্নচিত্তে তাহা আহার করিয়া বলিলেন—

"শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ
প্রাপ্ত মাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাল বিচারণা॥"

মহাপ্রসাদ শুষ্ক হউক কিংবা পর্য্যুসিত হউক অথবা দূরদেশ হইতে আনীত হউক অর্থাৎ যবনাদিদ্বারা সংস্পৃষ্ট হউক, প্রাপ্ত মাত্র তাহা সেবন করিবে কাল বিচার করিবে না।

এবং প্রভু চৈতন্যদেবও—

"মহাপ্রসাদ গোবিন্দে নাম ব্রহ্মনি বৈষ্ণবে
স্বল্প পুণ্য বতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।"

এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া সার্ব্বভৌমের হাত ধরিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

মায়াবাদী সার্ব্বভৌম চৈতন্যের অলৌকিক শক্তি প্রভাবে তাঁহার একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন জানিতে পারিয়া, উৎকল রাজের ইষ্টদেব কাশীমিশ্র

ও নীলাচলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণও তাঁহার পদানত হইলেন। অনন্তর মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইয়া পড়িল। চৈতন্যদেব গরুড়-স্তম্ভের নিকট হইতে একটী কোণে দাঁড়াইয়া দেব দর্শন করিতেন এবং তৎস্থানস্থ একটী স্তম্ভের উপর আজও একটী চিহ্ন আছে, তাহাকে লোকে চৈতন্যদেবের অঙ্গুলি চিহ্ন বলিয়া থাকে। দেব দর্শনের সময় তিনি ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইয়া পড়িতেন। একদা কোনও উড়িয়া স্ত্রীলোক বিষম জনতায় দেবদর্শন করিতে না পারিয়া চৈতন্যদেবের স্কন্ধে পদ ন্যস্ত করিয়া উঠিয়া দেব-দর্শন করিয়াছিল। তাঁহার অনুচরেরা স্ত্রীলোকটীকে ভৎসনা করিতে উদ্যত হইলে, চৈতন্যদেব নিবারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, দেবদর্শনাভিলাষিণী ভক্তিমতি স্ত্রীলোককে কিছু বলিও না। তিনি ভাবিলেন যদি এই রমণীর মত নিবিষ্ট চিত্ততা পাইতাম তাহা হইলে আমিও কৃতার্থ হইয়া যাইতাম।

কিছুকাল পুরীধামে বাস করিয়া চৈতন্যদেব সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন; তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি উৎকলরাজের ইষ্টদেব কাশীমিশ্রের আবাসে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। জগন্নাথদেবের সেবক জনার্দ্দন মহাপাত্র, লিখনাধিকারী শিখি মাহান্তি ও তাঁহার ভ্রাতা মুরারি ও মাধব মাহান্তি এবং প্রহরীরাজ মহাপাত্র প্রভৃতি অনেক গণ্য মান্য লোক চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পুরীর তদানীন্তন রাজা প্রতাপরুদ্র (১৫০৪-৩২) চৈতন্যের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার দর্শন প্রার্থী হইলে তিনি বিষয় ও স্ত্রীলোককে দর্শন অপেক্ষা বিষভক্ষণ শ্রেয়স্কর মনে করিয়া প্রস্থান অনুমতি করেন। ভগ্ন মনোরথ হইয়া রাজা প্রভুর একখানি বহির্ব্বাস শিরে করিয়া প্রতিদিন ভক্তিভরে তাহার পূজা করিতেন। রথযাত্রার দিনে সার্ব্বভৌমের পরামর্শে রাজা নিতান্ত দীনবেশে উদ্যান হইতে প্রভুকে দর্শন করিতেন। এই সময়ে নবদ্বীপ হইতে বহুসংখ্যক ভক্ত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। চৈতন্য অনেকগুলি সংকীর্ত্তনের সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া পুরীবাসীগণকে হরিনামে মাতাইয়া তুলিয়া ছিলেন। বক্রেশ্বর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও শ্রীবাস চারিটি সংকীর্ত্তন দলের মুখ্যকর্ত্তা ছিলেন। চৈতন্যদেবই রথের সম্মুখে বেড়া সংকীর্ত্তনের সৃষ্টি করেন। মহাপ্রভু গৌড়বাসী ভক্তগণের সহিত শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের আরতির সময় অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর কীর্ত্তন

করিতেন। এই সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া উড়িষ্যাবাসীগণ বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই উড়িষ্যায় সংকীর্ত্তনের সৃষ্টি। গুণ্ডিচা মন্দির অপরিষ্কার হইলে তিনি নিজহস্তে তাহা পরিষ্কার করিতেন। প্রতাপ-রুদ্রের পুত্রের সহিত ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সখ্যতা সঞ্চার হইয়াছিল। একদিন তাঁহার ভাবাবেশ হইলে প্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব বেশে চৈতন্যের পাদ-মর্দ্দন করিতেছেন, এমন সময় চৈতন্যদেব তাঁহাকে প্রেম আলিঙ্গনে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। কোনও বৎসর জগন্নাথদেবের রথ কোন গূঢ় কারণে চালিত না হওয়ায় চৈতন্যদেব নিজ মস্তক দিয়া তাহা ঠেলিবা মাত্র রথ চলিয়াছিল। প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসে তিনি ভক্তগণকে হরিনাম প্রচারের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করিতেন, এবং রথযাত্রার পূর্ব্বাহ্নেই আবার তাহা-দিগকে পুরীধামে আনাইবার ব্যবস্থা করিতেন। কাঁচড়াপাড়া নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ পরম বৈষ্ণব শিবানন্দ সেন তাঁহাদের পথের ব্যয় ও আবাস স্থানের সংস্থান করিয়া দিতেন। ইঁহার পুত্র পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর নামে খ্যাত হয়েন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় "চৈতন্য চরিত" নামে অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এইরূপে পুরীতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিয়া তিনি দেশে জননীর চরণ ও গঙ্গা দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। সে যাত্রা তিনি দেশে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বৃন্দাবনে যাওয়া ঘটে নাই। কিছুদিন শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া তিনি পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কয়েক মাস পুরুষোত্তমে থাকিয়া তিনি রাজপথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথে (ঝারিখণ্ডে) বৃন্দাবনে যাত্রা করেন, এবং বৃন্দাবন, মথুরা প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া সেই পথেই পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া যান। কথিত আছে কোনও শারদীয় নিশায় রাসের কথা কহিতে কহিতে চৈতন্যদেব আত্মভাবে যমুনাভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ প্রদান করিয়াছিলেন। অনেকের মতে এইদিনেই তাঁহার জীবলীলার অবসান হয়, কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ বলেন তিনি আরও কয়েক মাস জীবিত ছিলেন; অষ্টাদশ বর্ষকাল নীলাচলে বাস করিয়া তিনি আপামর সাধারণকে মধুর হরিনামে মাতোয়ারা করিয়া সংসারের রঙ্গালয় হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। ৪৮ বৎসর বয়সে একদিন রথাগ্রভাগে নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর পাদনখে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল এবং তাহার

ফলে তাঁহার সামান্য জ্বর বোধ হয়। পরদিন তিনি প্রাতঃকালে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে যাইয়া আর প্রত্যাগত হন নাই। কেহ কেহ বলেন তিনি দিব্যদেহে আকাশ পথে প্রয়াণ করিয়াছিলেন; কাহারও বা মতে প্রভু জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহে নিজদেহ বিলীন করেন।

কেহ কেহ আবার বলেন গৌরাঙ্গ, পণ্ডিত গদাধর-প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহেই বিলীন হইয়াছিলেন। চৈতন্যের লোকান্তর প্রাপ্তির পরে বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে নারায়ণের অবতার জ্ঞানে মন্দিরের একপার্শ্বে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সমগ্র উৎকল দেশে অসংখ্য চৈতন্য মূর্ত্তি বিগ্রহরূপে পূজিত হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে প্রধান প্রধান পল্লীতে জগন্নাথদেবের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গদেব পূজিত হইয়া থাকেন। প্রতাপপুর গ্রামে মহারাজ প্রতাপরুদ্র-প্রতিষ্ঠিত নিম্বকাষ্ঠ নির্ম্মিত শ্রীমূর্ত্তি এখনও বিরাজমান। পুরীতে গমন করিয়া গঙ্গামাতা মঠ, সিদ্ধবকুল ও টোটা গোপীনাথ প্রভৃতি দর্শন করা কর্ত্তব্য।

জয়দেব।

জগন্নাথদেবের অতিপ্রিয় গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেবের জীবনের প্রথমাংশ পুরুষোত্তমেই অতিবাহিত হইয়াছিল। জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী, নিবাস বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্বগ্রাম। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সদাশিব কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলেন যে জয়দেব পুরীর অন্তর্গত নিমপাতার সন্নিকটে কেন্দুলী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বীরভূমবাসী নহেন। একজন মান্দ্রাজবাসী ও উক্ত মতের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। যৌবনে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তিনি পুরুষোত্তমে গমন করিয়া উৎকলাধিপের সভাকবি পদে বরিত হইয়াছিলেন।

কথিত আছে জনৈক ব্রাহ্মণের সন্তান না হওয়ায় জগন্নাথদেবের নিকট "ধন্না" দিয়া সন্তান প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন, যে প্রথম সন্তানটী জগন্নাথ-দেবকে উৎসৃষ্ট হইবে। দেবতার অনুগ্রহে সেই ব্রাহ্মণের পদ্মাবতী নামে একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। কন্যাটী বিবাহযোগ্যা হইলে ব্রাহ্মণ তাহাকে জগন্নাথদেবের স্থানে উৎসর্গ করিতে যাইবে, এমন সময়ে জগন্নাথদেব স্বপ্নযোগে এই প্রত্যাদেশ করেন, যে জয়দেব নামে আমার এক প্রিয় ভক্ত সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবৎ-আরাধনায় নিবিষ্ট-চিত্ত আছে তাহাকে তুমি এই কন্যাটী

সম্প্রদান কর। ব্রাহ্মণ কন্যাকে সঙ্গে লইয়া জয়দেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত রহস্য বিজ্ঞাপিত করিলেন। কিন্তু তিনি বিবাহ করিতে অসম্মত হওয়ায়, ব্রাহ্মণ কন্যাটী জয়দেবের নিকট রাখিয়া প্রত্যাগমন করেন; অনন্তর জয়দেব অগত্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন।

কথিত আছে জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দ কবিতায় পরম পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধিকার পদ ধারণ করিয়াছিলেন ইহা লিখিতে কুণ্ঠিত হইয়া লিখন কার্য্য স্থগিত রাখিয়াছিলেন এবং তিনি সমুদ্রস্নানে গমন করিলে জগন্নাথদেব তাঁহার অনুপস্থিতিতে জয়দেবের বেশ ধরিয়া আসিয়া পদ্মাবতীর সম্মুখেই "দেহি পদ পল্লব মুদারম্" লিখিয়া গিয়াছিলেন।

সেই হইতে গীতগোবিন্দ জগন্নাথদেবের মন্দিরে এবং অন্যান্য স্থানে গীত হইতে লাগিল। জনসাধারণের নিকট গীতগোবিন্দের আদর দর্শন করিয়া তদানীন্তন উৎকলরাজ সাত্যকি একখানি গীতগোবিন্দ গ্রন্থ রচনা করিয়া জগন্নাথদেবের পদারবিন্দে অর্পণ করেন, কিন্তু মন্দিরে তাঁহার রচিত সেই গীতগোবিন্দ লোক সমাজে আশানুরূপ আদর লাভ করে নাই বুঝিয়া তিনি অভিমানে সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কৃত সঙ্কল্প হয়েন। তাহাতে জগন্নাথ-দেব প্রত্যাদেশ করেন যে তুমি আত্মহত্যা করিও না। জয়দেব-বিরচিত গীতগোবিন্দ কবিতায় তোমার রচিত দ্বাদশটী শ্লোক গ্রথিত থাকিবে এবং মন্দিরে গীত হইবে। অদ্যাপি মন্দিরে প্রত্যহ দেবদাসীগণ গীতগোবিন্দ গান করিয়া থাকেন।

"অদ্যাবধি জগন্নাথ ত্রিসন্ধ্যা যে গীত,
না শুনিলে নাহি হয় নিদ্রাহার নিত।"

শেষ বয়সে জয়দেব নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া নিজ ভূমি কেন্দুলী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানেই অতি পরিণত বয়সেই তাঁহার জীবলীলার অবসান হয়। *

জ্ঞাতব্য বিষয়।

তীর্থযাত্রীগণের পক্ষে পুরীতে প্রবাসের সময় স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা

* কবিবর ভারতচন্দ্র ও পুরীধামে যাইয়া অনেক কাল বাস করিয়াছিলেন। মান সিংহ ও পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন।

আবশ্যক। জগন্নাথ বল্লভ নামক উদ্যানের সম্মুখে রাজপথের উপর মিউনিসিপ্যাল বাজার। পুরীর মন্দিরের উত্তরে লক্ষ্মী বাজারে নানাবিধ তরকারী ও ফল প্রভৃতির দোকান আছে। পুরীর সের আমাদের দেশের সের অপেক্ষা পাঁচ ছটাক বেশী। সিংহ দ্বারের সম্মুখে দুগ্ধ, দধি ও ছানা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আদালতের প্রাঙ্গনস্থিত কূপোদক ও ডাক বাংলার এবং হরিদাস ঠাকুরের সমাধি বাটীর কূপের জল বেশ স্বাস্থ্যকর। বাজারের খাবার খাওয়া উচিত নহে, তাহাতে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। অতি সামান্য ব্যয়ে যথেষ্ট মহাপ্রসাদ পাওয়া যায়। তাহাই ভক্ষণ করা উচিত। সুগন্ধ কৃষ্ণভোগ চাউলের বা গন্ধেশ্বরী অথবা হরিদাসী চাউলের মহাপ্রসাদ ১৮।২০ জনের উপযোগী এক হাঁড়ীর দাম ২৲।৩৲ টাকা মাত্র। এতদ্ভিন্ন অড়হর মুগ প্রভৃতি ডাল, মস্থর (মরিচের ঝাল দেওয়া তরকারী) বেসব, (সরিষা বাটা দেওয়া তরকারি) খাট্টা (টক্) প্রভৃতি এক টাকায় ছোট তিন হাঁড়ী পাওয়া যায়। জিনিষ পত্র প্রভৃতির উড়িয়্যার নাম নীচে দেওয়া হইল।

কলা	... কদলী।	পেঁপে	... অমৃতভাণ্ড।
কাঁচকলা	... কাঁচাকদলী।	গণ্ডা	... পুঞ্জা।
কাঁঠাল	... পনস।	তামাক	... গোড়াকু।
এচোড়	... কাঠা।	গাঁদাল	... পসরিনী।
ঝিঙ্গে	... জন্নি।	বোরা	... অখা।
উচ্ছে	... কলরা।	পিলসুজ	... দীপরখা।
সজিনাডাঁটা	... সুঁই।	কোদাল	... কুড়ি।
চালদা	... অয়।	কাটারি	... কোটুরী।
ঝুনা	... নাড়িয়া।	ঝাঁটা	... পহরা।
ডাব	... পয়ড়া।	হাঁড়ী	... হাণ্ডী, অটিকা।
ডাল	... ডালি।	রাঙ্গাআলু	... কন্দ।
চালকুমড়া	... পানিকাঁখারু।	তেঁতুল	... তেঁতুলি।
কচু	... সারু।	গুটে	... একটা।
পাতা	... পত্র।	মুলিয়া	... মজুর।
বেগুন	... বাইগণ।	উখড়া	... খই।
আনারস	... সপুরি।	তরকারি	... পরিবা।

কত দর—কেতে লেখা ইত্যাদি—

চতুর্থ অধ্যায়

কোণার্ক।

কোণার্কের সূর্য্যদেবের মন্দির পুরীর পূর্ব্বদিকে প্রায় ৯ ক্রোশ দূরে প্রাচী নদীর শাখা চন্দ্রভাগা তীরে অবস্থিত। সূর্য্যদেবের নাম-সংশ্লিষ্ট সিন্ধু নদীর শাখা চন্দ্রভাগা নদীর নামানুসারে সম্ভবতঃ এই নদীর নামকরণ হইয়া থাকিবে। কোনাকোনা নামক স্থানে "অর্কের" (সূর্য্যদেবের) মন্দির, এই জন্য ঐ স্থানের নামও কোণার্ক হইয়াছে। পূর্ব্বে এই মন্দির চন্দ্রভাগার সমুদ্র-সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল, কিন্তু এক্ষনে সমুদ্র প্রায় এক মাইল দূরে অপসারিত হইয়াছে। কাঠজুড়ি নদীর জল পূর্ব্বে প্রাচীনদী দিয়া সমুদ্রে প্রবাহিত হইত এবং প্রাচীনদীর শাখা চন্দ্রভাগাতীরে পূর্ব্বে অনেকগুলি গণ্ডগ্রাম ছিল। পরে কোয়াখাই নদী প্রবল হওয়ায় প্রাচীনদীর মুখ বন্ধ হইয়া যায় এবং সেই হইতে গ্রামগুলিও ক্রমে ক্রমে ধ্বংশ মুখে নিপতিত হয়। এখনও স্থানে স্থানে তাহার অসংখ্য ধ্বংশাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। রামচণ্ডী ঠাকুরাণীর মন্দির হইতে কোণার্ক যাইবার পথে অনেক ইষ্টক নির্ম্মিত বাটীর ধ্বংশাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রভাগা নদী এক্ষনে মজিয়া গিয়া স্বল্প-তোয়া হইয়া গিয়াছে। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাহাতে এখন জল থাকে না, কেবল সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী তিন শত হাত পরিমিত ব্যবধান স্থানে সমস্ত বৎসর অতি অল্প পরিমাণে জল থাকে।

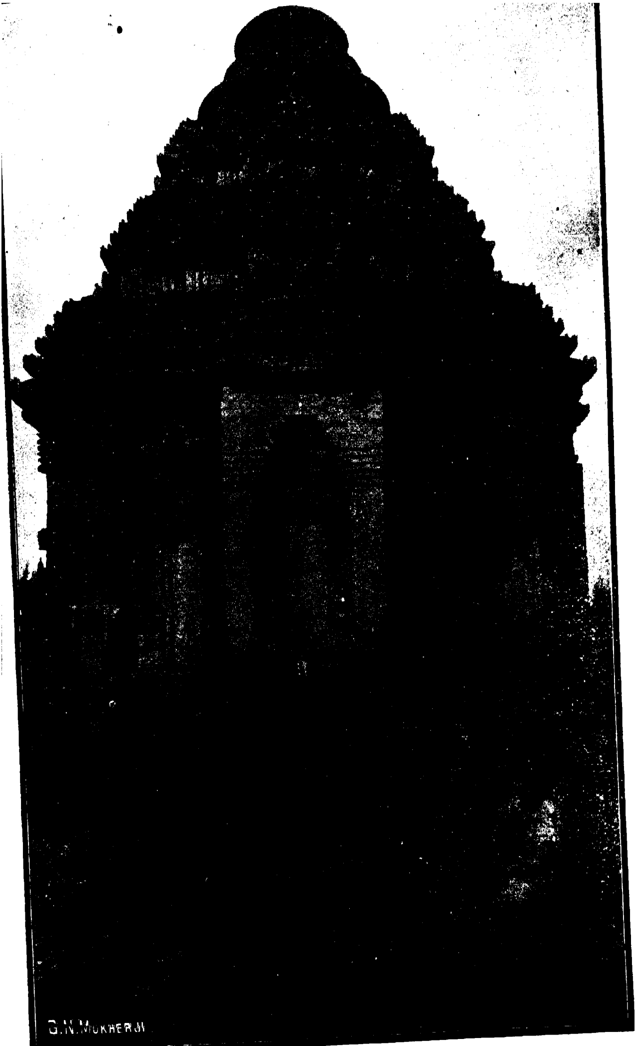
পুরী হইতে গোযান সহযোগে অপার বালুকারাশি ভেদ করিয়া যাত্রা করিতে হয়। পথে লোকালয়ের অভাব এবং খাদ্যাদি ও আনায়াস লভ্য নহে। সেই জন্য কোণার্ক-যাত্রীগণ খাদ্যাদি সঙ্গে লইয়া যাত্রা করেন। পথিমধ্যে পানীয় জলের একান্ত অভাব। কিন্তু স্থানে স্থানে বালুকারাশি একহাত দেড়হাত খনন করিলেই সুমিষ্ট জল পাওয়া যায়; গোযান যোগে যাতায়াতের ব্যয় ৫৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত।

পুরী হইতে যাত্রা পথে নিয়াখিয়া (বাঙ্গালাতে অর্থ 'নাওয়া খাওয়া') নামক একটী নদী উত্তীর্ণ হইতে হয়। কোয়াখাই নদী হইতে যে কুশভদ্র নদী বাহির হইয়াছে, তাহারই শেষ ভাগকে নিয়াখিয়া বলে। নিয়াখিয়া হইতেই কোণার্ক মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে রামচণ্ডী ঠাকুরাণীর মন্দির আছে। পাণ্ডাগণ বলেন রামচন্দ্র এখানে পূজা করিয়াছিলেন।

আইনি আকবরীতে কোণার্কের মন্দির সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। সাহেবেরা ইহাকে Black Pagoda বলেন এবং সেইজন্ত পুরীর মন্দিরকে White Pagoda বলা হয়।

শাম্ব পুরাণে লিখিত আছে।

দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব দেখিতে অতি সুশ্রী ছিলেন এবং তিনি কৌতুক করিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। একদা তিনি দেবর্ষি নারদের সহিত এরূপ অযথা কৌতুক করিয়াছিলেন যে নারদ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। নারদ কৃষ্ণের নিকট গিয়া বলিলেন আপনার মহিষীগণের মধ্যে সুন্দর-দর্শন যুবক শাম্বকে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে, কৃষ্ণ বলিলেন, শাম্ব আমার পুত্র, সুতরাং এরূপ সন্দিহান হইবার কোনও কারণ নাই, নারদ বলিলেন শাম্ব আপনার পুত্র বটে কিন্তু আপনার মহিষীত তাঁহার বিমাতা ; শ্রীকৃষ্ণ কথাটী উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু "ঢেঁকি"ঠাকুর নারদ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। একদা শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ রৈবতক গিরিতে জল ক্রীড়া করিতেছেন এমন সময়ে নারদ শাম্বকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমার পিতার নিকট এই পত্র খানি দিয়া আমার আগমন সংবাদ তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত কর। পরে তিনি তাঁহাকে জলক্রীড়া স্থলে গমন করিতে বলিলেন। শাম্ব আনন্দিত চিত্তে জলক্রীড়া স্থলে উপস্থিত হইলেন। এদিকে নারদ কৃষ্ণকে বলিলেন আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা সত্য কি না আজ দেখাইব। এই বলিয়া কৃষ্ণকে জলক্রীড়া স্থলে যাইতে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণ নারদ-ঘটিত ব্যাপার কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি সরল প্রাণে সেখানে যাইয়া শাম্বকে তথায় দেখিবামাত্র অভিসম্পাত করিলেন, 'পাপাত্মন! এই গর্হিত আচরণের ফলভোগ হেতু তুই কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্থ হ' শাম্ব পিতৃসমীপে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। পরে নারদের উপদেশ অনুসারে সূর্য্যদেবকে



কনার্ক

সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ব্যাধিমুক্ত হইবেন বুঝিয়া, কোনাকোনার সন্নিকটে মৈত্রেয় বনে সূর্য্যদেবকে আরাধনা করিতে লাগিলেন। শাম্বের স্তবে সূর্য্য সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্বপ্নে শাম্বকে দেখা দিলেন। পরদিন স্নান করিতে যাইয়া চন্দ্রভাগা নদীতে পদ্ম পত্রের উপর শাম্ব সূর্য্য প্রতিমা দেখিতে পাইলেন এবং রোগমুক্ত হইয়া চন্দ্রভাগাতীরে সূর্য্যদেবের এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। সে মন্দির অবশ্য বর্ত্তমানে বিদ্যমান নাই। শাম্ব প্রতিমা স্থাপন করিয়া দ্বারকায় পুনরাগমন করেন।

বর্ত্তমান মন্দির গঙ্গাবংশীয় রাজা নৃসিংহদেব (১২৩৮—৬৪) নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন কেশরী বংশীয় রাজা সিদ্ধশেখর ১২৭৩ খৃঃ অব্দে শিবাই সন্তুরার তত্ত্বাবধানে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

কথিত আছে মন্দিরের শিখরদেশে একটী চুম্বক লাগান ছিল বলিয়া সমুদ্রের জাহাজ সকল তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তীরে সংলগ্ন হইয়া জলমগ্ন হইত। কোনও মুসলমান নাস্তিক মন্দির শিখর হইতে চুম্বকটী ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়। যবন স্পর্শে মন্দির কলুষিত হওয়ায়, সেবকগণ মন্দির ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। মন্দিরের চূড়ার পতন সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক গল্প প্রকাশিত আছে, কিন্তু সেগুলি বিশ্বাস যোগ্য নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

মন্দিরটী ভগ্নাবস্থাপন্ন হইয়াছে। আদিম বৃহৎ মন্দিরটী ভগ্নাবশেষ অবস্থায় স্তূপাকারে পতিত আছে, সম্মুখস্থ জগমোহন অর্দ্ধ ভগ্নাবস্থায় আছে; ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য কোন পথ নাই। জগমোহনটী চতুষ্কোণ; দৈর্ঘ্যে ৬৬ ফুট ও প্রস্থে ৬৬ ফুট। মহারাষ্ট্রীয়গণ এই মন্দিরের প্রস্তর আনয়ণ করিয়া পুরীর মন্দির সংস্কার করাইয়াছিলেন, এবং কোণার্কের মন্দিরের অরুণস্তম্ভটী এক্ষণে পুরীর মন্দিরের সম্মুখে রক্ষিত আছে। মন্দিরটী রথের আকারে গঠিত এবং বড় বড় কয়েকটী প্রস্তর নির্ম্মিত চক্র মন্দিরের নিম্নে সংলগ্ন থাকায় মন্দিরটী ঠিক একটী রথের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে।

মন্দিরের শিখরদেশে তিনটী সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির প্রাঙ্গণে আরও দুইটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তন মন্দিরের নিম্ন অর্দ্ধাংশ সম্পূর্ণ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। একটী মন্দিরের উপর গঙ্গাদেবীর, ব্রহ্মার ও অন্যান্য বিস্তর দেব দেবীর সুন্দর সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। হস্তী ও

অশ্বদারের উভয় পার্শ্বে যথাক্রমে দুইটী করিয়া হস্তী ও অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বকালের মূল তোরণ বা প্রাচীর কিছুরই অস্তিত্ব নাই মন্দিরের অভ্যন্তরভাগে কোনও দেবমূর্ত্তি নাই। রাজা সিংহদেব (১৬২৬।২৭) কোণার্ক মন্দির হইতে সূর্য্যমূর্ত্তি জগন্নাথ মন্দিরের চত্বর-মধ্যস্থ ইন্দ্রদেবের মন্দিরে স্থানান্তরিত করেন। মন্দিরের নিকট একটী উদ্যানে শিবলিঙ্গ, সূর্য্য নারায়ণ প্রভৃতি দেবতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে।

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরাজগণ কত কোটী কোটী অর্থব্যয়ে স্থপতি বিদ্যার কি আশ্চর্য্য নিপুণতাই না প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন! দর্শন করিবার সাধ যাঁহার আছে কোণার্কের অর্ক মন্দিরে তিনি আসুন। বঙ্কিম বাবু "সীতারামে" লিখিয়াছেন "এখন কিনা হিন্দুকে Industrial School এ পুতুল গড়া শিখিতে হয়। কুমার সম্ভব ছাড়িয়া সুইন্‌বর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চিনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না।" জগন্নাথদেবের মন্দির ব্যতীত ভারতে আর এরূপ কারুকার্য্য পূর্ণ মন্দির কুত্রাপি নাই। *

একজন ইউরোপীয় কোণার্কের মন্দির দেখিয়া বলিয়াছেন—

> "It is for its size, the most richly ornamented building in the whole world" Picturesque Illustrations of Ancient Architecture in Hindustan, P. 27.

অর্থাৎ আকারানুসারে এই কারুকার্য্য-খচিত মন্দিরটী ভূমণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তিন খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর মন্দির হইতে স্খলিত হইয়া প্রাঙ্গণে পড়িয়া আছে। ৬০।৭০ মাইল দূরে ভিন্ন নিকটে কোনও পাহাড় নাই। নদীও চতুর্দ্দিকে অসংখ্য আছে বটে, কিন্তু তাহার উপর কোন সেতু ছিল না; কি কৌশলে এই সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর পাহাড় হইতে আনিয়া ১০০।১৫০ ফুট উচ্চে মন্দিরের উপর উত্তোলিত হইয়াছিল, এক্ষণকার সুনিপুণ স্থপতি বিদ্যা ধুরন্ধর ইঞ্জিনিয়ারগণ ভাবিয়াও তাহার কোন কিনারা করিতে পারেন নাই।

---

* ভারতগৌরব রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে ভুবনেশ্বর মন্দির সপ্তম শতাব্দীতে, কোণার্কের মন্দির দ্বাদশ শতাব্দীতে স্থপতি বিদ্যার বিশেষ অবনতির সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আমাদের দেশের স্থপতি বিদ্যার পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের কথা নহে। O'Malley সাহেব বলেন, মন্দিরটী পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল এবং নিকটবর্ত্তী নদী গুলিতে যথেষ্ট জল সংস্থান থাকায় নৌকাযোগে প্রস্তর রাশি দূরান্তর হইতে আনীত হওয়ার সুযোগ ঘটিত। অনেকে আবার অনুমান করেন যে মন্দির যতটুকু অংশ গাঁথা হইত, ততটুকু অংশে বালিপূর্ণ করিয়া দিয়া পাথরগুলি গড়াইয়া গড়াইয়া তাহার উপর তোলা হইত। প্রবাদ, খণ্ডগিরির প্রস্তরে ভুবনেশ্বরের, কোণার্কের ও শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে।

যাঁহারা মনে করেন যে সাহেবেরাই প্রথমে এদেশে লোহার কড়ি আমদানি করিয়াছেন তাঁহারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে ভুবনেশ্বরের ও কোণার্কের মন্দিরে বড় বড় লোহার কড়ি ব্যবহৃত হইয়াছিল। কতকগুলি কড়ি মন্দির হইতে বিচ্যুত হইয়া নিম্নদেশে পতিত অবস্থায় আছে। এত বড় বড় লোহার কড়ি কোথায় প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারেনা। O'Malley সাহেব বলেন "Not only were the girders of great size, but it is noticeable that their thickness gradually increases from the ends to the centre, showing a knowledge of the properties and the strength of the material that is remarkable in a people who are now so utterly incapable of forging such masses" রাজসাহী গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী প্রণীত "Iron in Ancient India" পুস্তক পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতীয় লৌহ শিল্প সম্বন্ধে পারদর্শিতা বিশেষরূপ অবগত হইবেন।

"The extraordinary iron beams which supplying the place of timber in later architecture support the great temple and the garden temple at Puri, the Black Pagoda at Kanarak, and the Temple of Bhubaneswar, all in Orissa * * * * * * At Kanarak the largest iron beam is 35 ft. long and from seven to seven and a half inches square, the whole weighing about 6,000 lbs." Statesman, dated October 4, 1914.

উপরোক্ত তিন খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের উপর যে সকল সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে তাহাদের কারুকার্য্য দর্শন করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। তাই Hunter সাহেব বলেন " * * Bishop Heber's criticism that the Indians built like Titans and finished like jewellers."

উহাদের এক খণ্ডের উপর নবগ্রহ মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। নবগ্রহ শিলাগুলি কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং উক্ত গ্রহগণের মধ্যে কাহারও হাতে জপমালা ও কাহারও হাতে পূর্ণঘট। কোণার্ক হইতে নবগ্রহ শিলা আনয়ন করিয়া কলিকাতা যাদুঘরে রাখিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু হিন্দুদিগের আপত্তিতে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইহা এক্ষণে মন্দির প্রাঙ্গণে দুইখণ্ড কাষ্ঠের উপর বসান আছে।

গবর্ণমেণ্ট হইতে মন্দির সংস্কারের বন্দোবস্ত হইয়াছে, পাথর আনয়নের পথ সুগম করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেল লাইন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহা উপরে তুলিবার জন্য উত্তোলন যন্ত্র (Crane) আনা হইয়াছে; টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য হাফিং বসান হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও সুচারুরূপে কার্য্য হইয়া উঠিতেছে না। চারিদিকের জঙ্গল পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। মন্দির সংস্কার সাধন করাইয়া যাহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি স্থায়ীভাবে রক্ষিত হয় সে বিষয়ের চেষ্টায় সরকার বাহাদুর আদৌ উদাসীন নহেন। এজন্য ভারতের সমগ্র হিন্দু সমাজ যে সরকার বাহাদুরের নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ তাহা বলাই বাহুল্য।

পুরুষোত্তম-তত্ত্বে লিখিত আছে যে, নরনারী সাগরে স্নান করিয়া কোণার্কের সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্যদান ও প্রণাম করিলে সকল কামনার ফললাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাহার পরে পুষ্পহস্তে যতবাক অবস্থায় সূর্য্যমন্দিরে গমন করিয়া সূর্য্যদেবকে পূজা ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিলে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই! শ্রীমন্দিরে অর্কদেব মূর্ত্তি আর বিরাজিত নাই। কথিত আছে এই অর্কমূর্ত্তি সুরকারু বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মাঘ মাসের শুক্ল সপ্তমীতে চন্দ্রভাগা নদীতে অবগাহন করিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে সূর্য্যদেবের উদয় দর্শন করিলে মহাপুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। এই সময় ১০।১২ সহস্র

লোক পুরী হইতে গো-শকটযোগে তথায় স্নান করিতে গমন করিয়া থাকেন। অপরিসীম সুনীল সমুদ্র হইতে অরুণোদয় বাস্তবিকই অতি মনোজ্ঞ দৃশ্য। রাত্রি চারিটা হইতে তীর্থ যাত্রীগণ চন্দ্রভাগা নদীর জলে স্নান করিতে আরম্ভ করে এবং স্নানান্তে অরুণোদয় দেখিবার জন্য সমুদ্র তীরে ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান থাকে। সূর্য্যরশ্মির অতি অস্ফুট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সহস্র কণ্ঠের হুলুধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠে। আহা সে কণ্ঠস্বর কতই না মধুর কতই না প্রাণারাম!

দর্শকগণের জন্য এখানে একটী বিশ্রাম-নিবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরী হইতে কোণার্ক পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। যদি তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মপ্রাণ বহু তীর্থযাত্রী এবম্বিধ দুর্গমস্থানে অনায়াসে গমন করিয়া অতীত গৌরবের শেষ চিহ্ন দর্শন করিবার সুবর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। হিন্দুর এ মনস্কামনা সিদ্ধির পথে ভগবান সহায় হউন ইহাই প্রার্থনা।

পঞ্চম অধ্যায়।

জগন্নাথ লীলাবলী।

বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীশ্রী ভক্তমাল গ্রন্থ ও উৎকল ভাষায় লিখিত দ্বিজ রামদাস প্রণীত "দার্ঢ্যতাভক্তি" নামক গ্রন্থ সাধুরচিতামৃত-রসে পরিপূর্ণ। অপ্রাকৃত ভক্ত চরিত্রসহ ভগবচ্চরিত্র গ্রথিত থাকে। জগন্নাথদেবের যে সমস্ত লীলাবলী উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে প্রকটিত আছে তাহাই নিম্নে বর্ণিত হইল :—

১। জগন্নাথী মাধবদাস।

মাধবদাস কৃষ্ণ-অনুরাগে তন্ময় ও আত্মহারা হইয়া অসার সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে বাস করিয়াছিলেন। একাগ্রচিত্তে জগন্নাথধ্যানে মগ্ন থাকিয়া দিবস-ত্রয়-ব্যাপী উপবাসী আছেন অবগত হইয়া, জগন্নাথদেব ভক্ত কষ্টে ব্যথিত হইয়া স্বীয় স্বর্ণথালী নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রসাদে পরিপূর্ণ করিয়া লক্ষ্মীদেবী হস্তে মাধবদাস সকাশে প্রেরণ করেন। মাধবদাস প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থালীখানি সমুদ্রতীরে রাখিয়া দেন। এদিকে শ্রীমন্দিরে পাণ্ডাগণ জগন্নাথদেবের স্বর্ণথালী দেখিতে না পাইয়া চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে সমুদ্রতীরে মাধবদাসের নিকট তাহা রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকেই চোর জ্ঞানে নানাপ্রকারে নিগৃহীত করিলেন। তাহাতে পাণ্ডাগণের প্রতি জগন্নাথদেবের এই প্রত্যাদেশ হয় যে "ভক্ত মাধবদাসকে নিপীড়িত করিয়া তাহারা তাঁহাকেই দারুণ নিগৃহীত করিয়াছে, স্বর্ণথালী তিনিই তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর এই ঘটনায় পাণ্ডাগণ মাধবদাসের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

সমুদ্রতীরে বালুকারাশির উপরে ভক্ত মাধবদাস দারুণ শীতে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া, ভক্তের ক্লেশ-সন্তাপহারী জগন্নাথদেব স্বীয় বহুমূল্য গাত্রবস্ত্র খানি মাধবদাসকে প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভাতকালে পাণ্ডাগণ জগন্নাথ-দেবের শীতবস্ত্র মাধবদাসের অঙ্গে অবস্থাপিত দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

একদা মাধবদাস সমভিব্যাহারে জগন্নাথদেব সত্যবাদী গোপালের উদ্যানে কতিপয় পনস অপহরণ করেন। উদ্যানরক্ষকগণ মাধদাসকে ধৃত করিয়া বন্ধন করিয়া রাখেন। মাধবদাস বলিলেন "প্রকৃত চোর পলায়ন করিয়াছে, আমি তাঁহার আজ্ঞাধীন অনুচরমাত্র" এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ কণ্টকবৃক্ষ লগ্ন জগন্নাথদেব পরিত্যক্ত পীতাম্বরবাস তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। উদ্যান রক্ষক ও পাণ্ডাগণ সেই পীতাম্বরবাস দর্শন করিয়া জগন্নাথদেবের লীলা হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক আনন্দবিভোর অবস্থায় মাধবদাসের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

মাধবদাসের নাম "জগন্নাথী মাধোদাস" হইয়াছিল।

২। রামানুজস্বামী।

রামানুজস্বামী জগন্নাথ দর্শনার্থে নীলাচলে গমন করিয়া তত্রত্য সূপকার-গণের অনাচার দর্শনে মনে মনে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তাঁহাদিগকে দুরীভূত করিয়া দিয়া স্বীয় সহস্রেক শিষ্য সহায়তায় শুদ্ধাচারে রন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করাইলেন। ভক্ত সূপকারগণ এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছেন দেখিয়া জগন্নাথদেব রামানুজকে তাঁহাদিগের পুনর্নিয়োগ সম্বন্ধে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল না দেখিয়া গরুড় দ্বারা সহস্রেক শিষ্য সহ রামানুজকে মন্দির হইতে দূরদেশে স্থানান্তরিত করেন। রামানুজ দেবাদিদেবের ইচ্ছা সম্পাদিত হইয়াছে বুঝিয়া বিশেষ সুখী হইলেন। ভক্তের প্রতি ভগবানের কি অনন্য সাধারণ উৎকট অনুরাগ!

৩। অর্জ্জুন মিশ্র।

অর্জ্জুনমিশ্র সস্ত্রীক পুরুষোত্তমে বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদা গীতাপাঠে সময় অতিবাহিত করিতেন এবং ভিক্ষাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতায় নবম অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে লিখিত আছে—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ *"

অর্থাৎ, যাহারা অনন্যমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করে, আমি, সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি। এই শ্লোক পাঠ করিয়া অর্জ্জুনমিশ্র মনে করিলেন, আমি ত ভগবানের একনিষ্ঠ সেবক, তিনি আমার কি করিলেন? 'যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকি' ভগবানের এই বাক্য ত সত্য নহে ভাবিয়া, অর্জ্জুনমিশ্র হস্তস্থিত লৌহ লেখনী দ্বারা সেই লিখিত পংক্তিটী কর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের অঙ্গ, সুতরাং লৌহ লেখনীর আঘাতে ভগবানের দেহ বিদ্ধ হইল, রামকৃষ্ণের কোমল অঙ্গে আঘাত লাগিল। অর্জ্জুনমিশ্র সেদিন ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোনও স্থান হইতে মুষ্টিভিক্ষাও সংগ্রহ হইল না। ইতিমধ্যে গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ—লাঞ্ছিত, দুইটী সুকুমার বালক নানাবিধ দ্রব্য পূর্ণ ভার স্কন্ধে গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনমিশ্রের গৃহিণী সকাশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, অর্জ্জুনমিশ্র মহাশয় এই সকল দ্রব্য সম্ভার প্রেরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণী সেই সমস্ত দ্রব্য যথামত ভাণ্ডারজাত করিলেন। অনন্তর তাঁহার মনে হইল, এরূপ অল্প বয়স্ক দুইটী বালক এরূপ পর্য্যাপ্ত-পরিমাণ দ্রব্য সম্ভার কিরূপে বহন করিয়া আনিতে সমর্থ হইল? সহসা বালক দুইটীর কোমল অঙ্গ হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতেছে দেখিয়া, ব্রাহ্মণী তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালকদ্বয় বলিলেন অর্জ্জুনমিশ্র লৌহশলাকাদ্বারা তাঁহাদিগকে এইরূপে আহত করিয়াছেন। তৎশ্রবণে ব্রাহ্মণী অত্যন্ত কাতরা হইয়া তাঁহাদিগকে নানারূপে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বালকদ্বয় সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইল! ব্রাহ্মণী শোকে বিহ্বল হইয়া ধরাশায়ী রহিলেন। অর্জ্জুনমিশ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহার বাকি রহিল না। তিনি ত কোনও বালকের স্কন্ধে কোন দ্রব্য সম্ভার

---

* "অনন্য অন্তরে সংসারে যে জন,
করে অবিরাম আমার অর্চ্চন,
সর্ব্বদা মন্নিষ্ঠ তাহার কারণ,
বহি যোগ ক্ষেম প্রসন্ন হ'য়ে ॥"

প্রেরণ করেন নাই! কিন্তু গীতার পাঠ ব্যভিচার সংঘটনই যে তাঁহা অম্লমাতয়ের্জ্জ অপরাধ তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেন। গীতা ভগবানের অঙ্গন তাহা তিনি লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করিয়া জগন্নাথদেবেরই কমনীয় অঙ্গে আঘাত করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। গীতার "বহাম্যহং" কথার যে উল্লেখ আছে তাহা যে প্ররোচনার বাক্য নহে, বাস্তব সত্য বাক্য, তাহাই ভগবান স্বয়ং ভার স্কন্ধে বহন করিয়া ভক্তকে চাক্ষুষ দেখাইয়াছেন। অনন্তর অর্জ্জুনমিশ্র জগন্নাথ পদে কোটি কোটি ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ভক্তি গদগদ ভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

উৎকল ভাষায় লিখিত 'দার্ঢ্যতা ভক্তি' গ্রন্থে এই অর্জ্জুনমিশ্রই "গীতাপোণ্ডা" নামে অভিহিত। তাহাতে লিখিত আছে 'গীতাপোণ্ডার' স্ত্রী স্বীয় স্বামীকে কেবল গীতা পাঠে সময় অতিবাহিত করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে গীতাপাঠে অহর্নিশ সমাহিত থাকিলে জীবিকা সংস্থানের উপায় কোথা হইী, কিরূপে হইবে? তাহাতে গীতাপোণ্ডা গীতায় উক্ত শ্লোকটী পাঠ করিয়া তাঁহাকে শ্রবণ করান। ব্রাহ্মণী গীতায় লিখিত 'যোগক্ষেমং বহাম্যহং' এই বাক্যটী সর্ব্বৈব মিথ্যা ও প্ররোচনার বাক্য বলিয়া উল্লিখিত স্থানটী লৌহ-শলাকাদ্বারা কর্ত্তন করিয়া দেন। গীতাপোণ্ডা স্ত্রীর ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এবং সাক্ষাৎ ভগবানের দেহ, ক্ষত হইয়াছে ভাবিয়া শোকে কাতর হইলেন। ইত্যবসরে দুইটী অল্প বয়স্ক বালক ভারস্কন্ধে ব্রাহ্মণীর নিকট আসিয়া বলিলেন "গীতাপোণ্ডার" কোনও বন্ধু এই সকল দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণী বালক দুইটীকে যত্ন সহকারে কিঞ্চিত আহারীয় প্রদান করিলেন; কিন্তু বালকদ্বয় স্ব স্ব জিহ্বা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তাঁহাদের জিহ্বা কর্ত্তিত হইয়াছে, এ অবস্থায় তাঁহারা আহার করিতে অক্ষম। জিহ্বা হইতে দরদর ধারে রুধির নির্গত হইতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর মন অস্থির হইল এবং তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিতে করিতেই বালকদ্বয় অন্তর্হিত হইলেন। গীতাপোণ্ডা গৃহান্তরে শোকসন্তপ্ত অবস্থায় ধরাশায়ী ছিলেন। ব্রাহ্মণীর মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার শোকের আর অবধি রহিল না। বালকদ্বয় যে কৃষ্ণ বলরাম তিনি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার গৃহে ভগবানের শুভ পদার্পণ, অথচ হায়! তিনি তাঁহার দর্শন পাইলেন না, তাহাতেই তাঁহার

দুঃসহ মর্ম্মান্তিক যাতনা হইল। ভগবৎ-পদে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গীতাপোণ্ডা গীতাপাঠেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

৪। সধনা।

বৈষ্ণব সধনা জাতিতে কসাই ছিলেন। নিজের জাতীয় ব্যবসায়, মাংস বিক্রয় পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া তিনি মাংস ক্রয় করিয়া আনিয়া বিক্রয় করিতেন। মাংস পরিমাপার্থে তিনি একটী শিলা ব্যবহার করিতেন, তাহা যে পবিত্র শালগ্রাম শিলা তাহা তিনি জানিতেন না। একদা কোনও ব্রাহ্মণ সধনার দোকানের নিকট দিয়া যাইবার সময় এ শিলাটী শালগ্রাম শিলা বলিয়া বুঝিতে পারিয়া বিশেষ আগ্রহ সহকারে শিলাটী আপন গৃহে লইয়া যাইয়া তুলসি চন্দনাদি দ্বারা তাহার পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাত্রে ব্রাহ্মণের প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল "আমি কসাই গৃহে সুখে ছিলাম। নিত্য কসাই মুখে হরিগুণ গান শ্রবণ করিয়া আমার মনে পরম পরিতোষ সঞ্চয় হইত, অতএব তুমি আমাকে আমার সেই ভক্ত গৃহে পুনরায় রাখিয়া আইস"। ব্রাহ্মণ প্রভাতে সধনা সমীপে গমন করিয়া শালগ্রাম শিলা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত স্বপ্নাদেশ ব্যাপার বিবৃত করিলেন। সমস্ত শুনিয়া সধনার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি মাংস ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া শালগ্রাম শিলাটী বক্ষে ধারণ করিয়া পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন।

পুরুষোত্তম পথে তাঁহার সঙ্গীগণ নীচজাতি বলিয়া তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করায়, তিনি একটী গ্রামের ভিতরে ভিক্ষা করিবার জন্য প্রবেশ করিলেন। অনন্তর কোন ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক সধনাকে আত্মসমর্পণ করিল, এবং তাঁহার প্রতি নিজের ঐকান্তিক অনুরাগ প্রদর্শন ছলে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে নিদ্রিত পতির মস্তক ছেদন করিয়া আনিয়া সধনার সম্মুখে স্থাপন করিল। তাহাতেও সধনা সেই দুষ্টার প্রেমে আকৃষ্ট হইলেন না দেখিয়া, সেই ভ্রষ্টা সধনাকেই তাহার স্বামীর হত্যাকারী বলিয়া নগর-রক্ষীর হস্তে অর্পণ করিল। বিচারক হত্যাকারীকে জিজ্ঞাসা করায়, সধনা সেই স্ত্রীলোকটীকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকেই হত্যাকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন। এদিকে বিচারের পূর্ব্বেই সেই ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকটী চারিদিকে এই রটনা আরম্ভ করিয়া দিল যে 'আমি নিজে স্বামীকে হত্যা করিয়া সধনার প্রেম ভিক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন সে আমার প্রতি

আকৃষ্ট হইল না দেখিয়া তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার সংকল্প করিতেছি।' বিচারক স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে হিংসাবৃত্তি আদৌ স্থান প্রাপ্ত হয় না। অনন্তর লোক পরম্পরায় সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া সধনাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন, এবং পক্ষান্তরে সেই ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকটীর প্রতি উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা দিলেন।

কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে সধনা পুরুষোত্তম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভক্তবৎসল জগন্নাথ পাণ্ডাগণকে শিবিকা যোগে আপন ভক্তকে আনয়ন করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। ভগবানের চক্ষে ভক্তের জাতি বিচার নাই, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল ভক্তের প্রতিই তাঁহার সমদৃষ্টি, সমজ্ঞান। যে সঙ্গীগণ সেই কসাই ভক্তকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাই এক্ষণে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। অহো, ভগবদ্ভক্তের কি অপার মহিমা, কি প্রকট মাহাত্ম্য !!

৫। লাখাজি।

মাড়য়ার দেশীয় ডোমজাতীয় জগন্নাথ-ভক্ত লাখাজি অহরহঃ জগন্নাথ-প্রেমে মাতোয়ারা থাকিতেন। বৈষ্ণব সেবাই তাঁহার কার্য্য ছিল। ছদ্মবেশে জগন্নাথদেব বৈষ্ণব সেবার উপযোগী যাবতীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতেন। একদা লাখাজি জগন্নাথ দর্শনান্তর গৃহে প্রত্যাগমন সময়ে ভাবিলেন, কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, অর্থবিনা কি করিয়া তাহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে? এদিকে জগন্নাথদেব বৈষ্ণব লাখাজির মনোভাব বুঝিতে পারিয়া জনৈক ধনীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করিলেন "লাখাজির গৃহে সহস্র মুদ্রা প্রেরণ কর" এবং তিনিও সেই আদেশমত কার্য্য করিলেন। লাখাজি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তাঁহার উপর নীলাদ্রিদেবের দয়ার বিষয় ভাবিয়া ভগবৎ প্রেমে গদগদ হইলেন।

৬। অঙ্গদ ভক্ত।

রায়সেনগড় নৃপতির খুল্লতাত যুদ্ধ-বিদ্যাবিশারদ অঙ্গদ অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন। তাঁহার পরম বৈষ্ণবী স্ত্রী তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। একদা অঙ্গদ তাঁহার স্ত্রীকে স্বীয় গুরুদেবের সহিত কথোপকথন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা

করিলেন। অভিমানিনী স্ত্রী স্বামী-ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া আত্মহত্যা করিবেন স্থির করিয়া, কয়েক দিবস অনাহারে দিন যাপন করিতে থাকায়, অঙ্গদ স্ত্রীকে নানামতে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। স্ত্রী কহিলেন "যদি তুমি আমার গুরুদেবের নিকট দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণভক্ত হইতে পার, তাহা হইলেই আমি আত্মহত্যা হইতে বিরত থাকিব, নতুবা অবিলম্বে তাহাই করিব।" স্বামী অগত্যা তাহাতে সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন এবং গুরুর অনুকম্পায় ক্রমশঃ পরমবৈষ্ণব হইয়া পড়িলেন।

একদা রাজা পিতৃব্য অঙ্গদকে কোনও প্রতিযোগী রাজার সহিত যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অঙ্গদ যুদ্ধে জয়ী হইয়া শত্রুপক্ষের যাবতীয় মনিমানিক্য হীরক, অলঙ্কারাদি আনয়ন করিয়া রাজাকে অর্পণ করিলেন, কেবল একখণ্ড বহুমূল্য হীরক জগন্নাথদেবেরই উপযুক্ত মনে করিয়া সেখানি রাজাকে অর্পণ করেন নাই; আপন শিরোবস্ত্রে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া তিনি জগন্নাথ মন্দিরা-ভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা পরম্পরায় উক্ত বহুমূল্য হীরকের কথা অবগত হইয়া হীরকখানি লাভ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ পথে অঙ্গদকে ধৃত করিল; কিন্তু অঙ্গদ ধৃত হইবামাত্র হীরকখানি সম্মুখবর্ত্তী পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া গন্তব্য পথে চলিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ মনে করিল, পুষ্করিণীর জল সেচন করিলেই হীরকখণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তদনুসারে তাহারা জল সেচন করিতে আরম্ভ করিল। পুষ্করিণীতে এক বিন্দুও জল রহিল না এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াও হীরকখণ্ড দৃষ্টিগোচর হইল না।

এদিকে পাণ্ডাগণ জগন্নাথদেবের মস্তকে বহুমূল্য একখণ্ড অপূর্ব্ব দীপ্তিশালী হীরকখণ্ড দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন। স্বপ্নাদেশ হইল, 'আমার মস্তকে যে ব্যক্তি হীরকখণ্ড স্থাপন করিয়াছে, সে আমার পরম ভক্ত, তাহার নাম অঙ্গদ। সে এই পবিত্রধামে আগমনোন্মুখ, তাহাকে সম্মান সহকারে আমার সম্মুখে আনয়ন কর।' শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া অঙ্গদ নিজ উপাস্যদেব জগন্নাথদেবের মস্তকে বাঞ্ছিত অমূল্য রত্নখানি সুন্দর শোভা পাইতেছে দেখিয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন।

"সেই হীরা অদ্যাবধি কপালে শোভয়।
পর্ব্বে পর্ব্বে পরয়ে সতত না পরয়॥"

৭। করমা বাই।

মাড়য়ার দেশীয় জগন্নাথভক্ত করমা বাই প্রত্যহ আদ্রক, মরিচ প্রভৃতি সংযুক্ত খেচরান্ন রন্ধন করিয়া জগন্নাথদেবকে ভোগ দিতেন। একদিন এক সাধু বৈরাগী স্নানাদি করিয়া পাক করিবার কথা বলায়, করমা বাই তাহাই করিলেন। সেদিন খেচরান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। এদিকে শ্রীমন্দিরে ভোগের সময় উপস্থিত হওয়ায় জগন্নাথদেব করমাবাই প্রদত্ত ভোগ আহার করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। সেবকগণ দেবমুখে খেচরান্নাবশেষ সংলগ্ন রহিয়াছে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। স্বপ্নাদেশ হইল, "আমি ভক্ত করমাবাই-প্রদত্ত ভোগই প্রত্যহ আহার করিয়া থাকি, কিন্তু কোনও বৈরাগীর কুযুক্তিতে খেচরান্ন প্রস্তুতে বিলম্ব হওয়ায় আমার বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। করমাবাইএর হৃদয়ের শুচি অবস্থাতেই আমি নিরতিশয় প্রীত, অতঃপর তাহাকে পূর্ব্বমত প্রাতে খেচরান্ন প্রস্তুত করিতে বলিবে।" করমাবাই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভগবৎ-প্রেমে আত্মহারা হইলেন এবং পূর্ব্বমত ভোগ রন্ধন করিয়া জগন্নাথদেবকে তাহা অর্পণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বৈরাগী আসিয়া করমাবাই ও জগন্নাথদেবের পদে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

"সেই যে করমাবাই নামে অদ্যাপিহ।
খিচুড়ি লাগয়ে ভোগ স্বর্ণথালী যেহ॥"

৮। বন্ধু মহান্তি।

জগন্নাথভক্ত বন্ধুমহান্তি অতি দরিদ্র; বিষম কষ্টে তিনি জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। একমাত্র পুত্র অনাহারে শীর্ণ হওয়ায় তাঁহার স্ত্রী একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কি এমন কোনও বন্ধু নাই, যাঁহার নিকট গমন করিলে আমাদের একদিনের আহারেরও ব্যবস্থা হইতে পারে?' বন্ধু মহান্তি উত্তর করিলেন 'পুরুষোত্তমে তাঁহার এরূপ একজন বন্ধু আছেন।' অনন্তর স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে তিনি সপরিবারে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাইয়া বেত্র-প্রহৃত অবস্থায় বন্ধু মহান্তি মন্দিরের দক্ষিণদিকস্থ পেজনালার নিকট রাত্রিতে অবস্থান করিলেন। পেজনালা দিয়া মন্দিরের পাচিত অন্নের ফেন বহির্গত হয়। ক্ষুধায় কাতর

হওয়ায় বন্ধু মহান্তি সেই পেজনালার ফেন স্বয়ং পান করিলেন এবং স্ত্রী পুত্রকেও তাহা প্রদান করিলেন। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার সেই বন্ধু কোথায়? তিনি বলিলেন এই স্থানেই আছেন। ভক্ত রঞ্জন জগন্নাথ অনশন পীড়িত ভক্তের কষ্টে বিচলিত হইয়া স্বয়ং প্রসাদ পরিপূর্ণ সুবর্ণ থালী হস্তে ভক্তের সমীপে উপস্থিত হইলেন। বন্ধু মহান্তি স্ত্রীকে বলিলেন আমার সেই বন্ধু স্বয়ং আসিয়া আমাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এদিকে মন্দির মধ্যে স্বর্ণথালী প্রাপ্ত না হইয়া সেবকগণ চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে করিতে পেজনালার সম্মুখে বন্ধু মহান্তির নিকট থালাখানি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের উপর প্রত্যাদেশ হইল 'আমার ভক্তকে মুক্তি প্রদান কর, বিনাদোষে তাহাকে নিগৃহীত করা হইয়াছে।' ভগবৎভক্ত রাজা প্রতাপরুদ্র স্বয়ং কারাগার হইতে বন্ধু মহান্তিকে মুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

৯। বলরামদাস।

বেশ্যাসক্ত বলরাম দাস জগন্নাথদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। একদা রথযাত্রা দিবসে রথ আকর্ষণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া তিনি রথযাত্রা পথে উপনীত হইলেন। কিন্তু জগন্নাথ সেবকগণ তাঁহাকে হেয়জ্ঞান করিয়া রথরজ্জু স্পর্শ করিতে দিতে সম্মত হইল না, প্রত্যুত তাহাকে নানারূপে নিগৃহীত করিয়া সেস্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। ভগ্ন মনোরথ হইয়া বলরাম সমুদ্র-তীরবর্ত্তী চক্রতীর্থে আসিয়া বালুকারাশির দ্বারা জগন্নাথ, বলরাম,ও সুভদ্রাদেবীর তিনখানি রথ প্রস্তুত করিয়া, জগন্নাথ ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। এদিকে শত হস্তী নিযুক্ত করিয়াও রথ-আকর্ষণ কার্য্য সম্পন্ন হইল না। জগন্নাথদেব ভক্ত বলরাম পাণ্ডাগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছে দেখিয়া রথ যাহাতে সেই ভক্ত বলরাম সাহায্য বিনা আকর্ষিত হইতে না পারে তাহা করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র স্বপ্নযোগে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া সেবকগণ-সমভিব্যবহারে চক্রতীর্থে উপনীত হইয়া বলরামকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। বলরাম আসিয়া রথ রজ্জু স্পর্শ করিবামাত্র রথ গমনশীল চলিষ্ণু হইয়া উঠিল। ভক্তের ভগবান ভক্তের মান রক্ষায় চিরকালই অনুদাসীন!

১০। তিলিছ মহাপাত্র।

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের রাজত্ব সময়ে জগবন্ধু মহাপাত্র নামে জগন্নাথদেবের একজন ভক্ত সেবক ছিলেন। একদিন মহারাজা অকস্মাৎ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন কিন্তু জগবন্ধু মহাপাত্র জগন্নাথদেবের মস্তকে কোনও পুষ্প দেখিতে না পাইয়া মহারাজকে কি প্রসাদ পুষ্প দিবেন ভাবিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। অনন্তর উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া তিনি স্বীয় মস্তকস্থ একটী পুষ্প লইয়া জগন্নাথদেবের মস্তকে স্থাপন করিয়া তাহাই মহারাজের হস্তে অর্পণ করিলেন। মহারাজা ভক্তিভরে পুষ্প গ্রহণ করিয়া প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন! সিংহাসনে বসিয়া প্রসাদ-পুষ্প হাতে করিয়া দেখিলেন যে তাহার সহিত একগাছা কৃষ্ণ কেশ রহিয়াছে। জগন্নাথদেবের মস্তকস্থ পুষ্পে কেশ থাকা সম্ভব নহে বুঝিয়া তাহা মহাপাত্রেরই মাথার কেশ স্থির করিয়া মহাপাত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহাপাত্র সম্মুখে উপস্থিত হইলে, মহারাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রসাদ পুষ্পের সহিত একগাছা চুল রহিয়াছে, প্রভুর মাথার চুল উঠিয়াছে কতদিন?' শুনিয়া মহাপাত্রের অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল, কিন্তু তিনি কায়মনে জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেন, 'দেব, অধমের প্রার্থনা সফল করুন।' এবং মহারাজকে বলিলেন 'প্রভুর মস্তকে কেশ আছে আপনাকে দেখাইব।' মহারাজা পরদিন যাইয়া এই অদ্ভূত ব্যাপার দর্শন করিবেন স্থির হইল। এদিকে মহাপাত্র অহর্নিশি দেবাদিদেবের মন্দিরে একাগ্রমনে তাঁহার অর্চ্চনায় রত রহিলেন এবং ভাবিলেন যদি প্রভুর অনুকম্পা না হয়, বিষ গ্রহণে আত্মহত্যা করিবেন। অনন্তর স্বপ্নাদেশ হইল। 'আমার মস্তকে কেশ আছে তুমি চিন্তাকুল হইও না'। প্রত্যূষে মহারাজ মন্দিরে আসিয়া প্রভুর মস্তকে কৃষ্ণ কেশ কলাপ দর্শন করিয়া বিষম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনে হইল 'হয়ত মহাপাত্র কৃত্রিম কেশ দাম আনিয়া প্রভুর মস্তকে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছে'। এইরূপ সন্দেহ করিয়া প্রভুর মস্তকের কেশ কয়টী ধরিয়া টানিবামাত্র, প্রভুর মস্তক হইতে দরদরিত ধারায় রুধির নিঃসারিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহারাজা মর্ম্মাহত হইলেন এবং ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইল। অনেকক্ষণ পরে সঙ্গীগণের চেষ্টায় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি মহাপাত্রের পদে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। উভয়ে প্রভুরদিকে

চাহিয়া দেখিলেন সে কেশরাশিও অন্তর্হিত হইয়াছে। ভক্তবৎসল ভগবান অকপট ভক্তের জন্য সকলই করিয়া থাকেন।

১১। জগন্নাথদাস।

পুরুষোত্তমধামে পণ্ডিত জগন্নাথদাসের বাসা ছিল। জগন্নাথ-ভক্ত জগন্নাথ-দাস জগন্নাথের অনুগ্রহে সুললিত ভাগবৎ রচনা করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে সেই ভগবৎগীতি শুনাইতেন। স্ত্রীলোকেরা কিছু অধিক গীতিপ্রিয়, তাঁহারা জগন্নাথদাসের গান শুনিয়া মোহিত হইতেন এবং অন্দরে লইয়া যাইয়া তাঁহাকে পরম আদর অভর্থনা করিতেন। কতকগুলি দুষ্ট লোক তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ কুৎসা রটনা করিয়া রাজার নিকট অভিযোগ করিল। রাজা জগন্নাথদাসকে আনাইয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। জগন্নাথদাস বলিলেন 'আমাকে যে আদর করে, আমি তাহাকে ভাগবৎ শুনাইয়া থাকি, আমি ব্রহ্মচারী, আমি পুরুষের নিকট পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নিকট নারীভাবাপন্ন! জগন্নাথদাসের কথায় রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন যদি তুমি স্ত্রীলোকের কাছে স্ত্রীলোক ইহা দেখাইতে না পার, তাহা হইলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। জগন্নাথদাস কারাগারে দিবারাত্রি ভক্তবৎসল জগন্নাথদাসকে এক প্রাণে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। পরদিন জগন্নাথদাস রাজার সমীপে নীত হইলে রাজা তাঁহার অনুপম রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ভগবৎ-গীতি শুনাইয়া তাঁহার পাপতাপ দূর করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। জগন্নাথ-দাস স্নানাহ্নিক শেষ করিয়া গান করিবেন বলিলেন। স্নানান্তে রাজার সমীপে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ-বেশ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভক্ত জগন্নাথদাস ভক্তিমাখা ভগবৎগানে রাজাকে এবং সভ্যগণকে মোহিত করিয়াছিলেন।

আজিও পুরীধামে হরিদাস ঠাকুরের সমাধির নিকট তাঁহার সমাধি মন্দির বিদ্যমান আছে। জগন্নাথদাসের ভাগবৎ গৃহে গৃহে গৃহ-দেবতার মত পূজিত হইয়া থাকে। তাঁহার সম্প্রদায়ের নাম 'অতিবড়ি' সম্প্রদায় এবং পুরীধামে উৎকল মঠ তাঁহাদের বাসস্থান।

১২। মনিদাস।

পূর্ব্বে জগন্নাথ মন্দিরের জগমোহনে পুরাণ পাঠ হইত। নীলাচল বাসী ভক্ত মনিদাস দুইটী নারিকেল মালার করতাল সহযোগে সর্ব্বদাই জগমোহনে কীর্ত্তন করিতেন। একদিন জগমোহনে পুরাণ পাঠ শুনিবার জন্য বহুলোকের সমাগম হইয়াছে এমন সময় ভক্ত মনিদাস ভগবৎ-ভাবে বিভোর হইয়া নারিকেল মালার করতালি বাজাইয়া সেখানে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পুরাণ-পাঠক পুরাণ-পাঠের ব্যাঘাৎ হইতেছে দেখিয়া তাঁহার উপর যৎপরো-নাস্তি কুপিত হইলেন। অনন্তর তাঁহার উত্তেজনায় শ্রোত্রীবৃন্দ মনিদাসকে প্রহার করিতে করিতে জগমোহন হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। মনিদাস সেদিন আর জগমোহনে গমন করিলেন না, অনশনে অন্যত্র জগন্নাথদেবের স্তব করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন। জগন্নাথদেব ভক্তের লাঞ্ছনায় ব্যথিত হইয়া পুরীরাজকে স্বপ্নাদেশ করিলেন 'তুমি স্বয়ং মনিদাসকে আপ্যায়িত করিবে, জগমোহন ভক্তগণের নৃত্যগীতের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে, এখানে পুরাণ পাঠ বন্ধ করিয়া লক্ষ্মীর মোহনে পুরাণ পাঠের ব্যবস্থা কর।' অনন্তর জগন্নাথদেব নিদ্রিত মনিদাসকে নানা আশ্বাস বচনে সন্তুষ্ট করিলেন। রাজা পরদিন পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে মনিদাস সকাশে গমন করিয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে জগমোহনে আনাইয়া যথোচিত আপ্যায়িত করিলেন। মনিদাস আপন নারিকেল মালা লইয়া পূর্ব্ববৎ জগন্নাথদেবের সম্মুখে মনের আনন্দে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। সেই অবধি জগমোহনে পুরাণ পাঠ বন্ধ আছে।

১৩। রঘুঅর্ক্ষিত।

রঘুঅর্ক্ষিত কলাবতীপুরে গঙ্গাধরের কন্যা অন্নপূর্ণাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুর বাটীতেই বাস করিতেন। ঘটনাচক্রে সংসারে বীতশ্রদ্ধ অবস্থায় পুরীধামে গমন করিয়া জগন্নাথদেবের প্রসাদ ভক্ষণ পূর্ব্বক পবিত্রভাবে জীবন ধারণ করিবেন ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প হইল। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি পুরীধামে বাস করিলেন। তদীয় পত্নী অন্নপূর্ণা পিত্রালয়ে অবস্থান করিতে থাকিলেন এবং তাঁহার পিতা গঙ্গাধর জামাতার কোনও অনুসন্ধান না পাইয়া কন্যাকে পুনরায় পাত্রস্থ করিবার সঙ্কল্প করিয়া ধনশালী বাসুদেব মহাপাত্রকে কন্যার যোগ্যপাত্র বলিয়া মনোনীত করিলেন। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয়

পক্ষই বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া কোনও পুরী-যাত্রী-হস্তে একখণ্ড পত্রদ্বারা স্বামীকে সমস্ত ব্যাপার অবগত করাইলেন এবং লিখিলেন যদি তিনি ফাল্গুন মাসের মধ্যে প্রত্যাগমন না করেন তাহা হইলে তাঁহাকে নারীহত্যার পাতক হইতে হইবে। রঘুঅর্ক্ষিত এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ইষ্টদেব জগন্নাথদেবের শরণাগত হইলেন।

ভক্তের প্রতি প্রভুর অপার করুণা! তিনি ভক্তের কষ্টে ব্যথিত হইয়া রঘুকে কলাবতীপুরে প্রেরণ করিলেন। গঙ্গাধর ও তাঁহার পুত্রগণ রঘুকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং বিবাহের সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইল বুঝিয়া বিষ প্রয়োগে রঘুর প্রাণনাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। অন্নপূর্ণা স্বামীর পুনরাগমনে আনন্দে আত্মহারা হইলেন বটে কিন্তু বিষ প্রয়োগ ব্যাপার অবগত হইয়া কি উপায়ে স্বামীর জীবনরক্ষা হইবে তাহারই উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। উপায়ন্তর না দেখিয়া তিনি কোনওরূপে স্বামীর বিষ সংসৃষ্ট আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে একখণ্ড পত্রে বিষ প্রয়োগ ব্যাপার স্বামীকে অবগত করাইলেন। রঘু আহারার্থে উপবেশন করিয়া অন্যান্য দিবসের ন্যায় সেদিনও স্বীয় আহার্য্য জগন্নাথদেবকে নিবেদন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পিষ্টক মধ্যে অন্নপূর্ণার রক্ষিত পত্রখানি পাঠ করিয়া আহারীয় দ্রব্যের সহিত বিষ মিশ্রিত পিষ্টক জগন্নাথদেবকে অর্পণ করিয়াছেন ভাবিয়া রঘু নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। বিষ মিশ্রিত হইলেও এক্ষণে উক্ত আহারীয়, জগন্নাথদেবের প্রসাদ, সুতরাং তিনি তাহা আর না আহার করিয়া থাকিতে পারিলেন না। আহারান্তে বিষ প্রভাবে রঘুর শরীর বিবর্ণ হইয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে তিনি ক্ষণকাল মধ্যে অচেতন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন। রঘুর অবস্থা দর্শন করিয়া অন্নপূর্ণার পিতার ও সহোদরগণের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা রঘুর সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে ঘোষণা করিয়া তাঁহার দেহ মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পতিরতা পতিপ্রাণা অন্নপূর্ণা স্বামীশোকে মুহ্যমানা হইয়া অনন্যোপায় অবস্থায় জগন্নাথদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী ভক্ত-রক্ষক জগন্নাথদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ভক্ত রঘুকে বিষমুক্ত করিলেন। রঘু সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া ঐরূপ বিপদ সঙ্কুল স্থানে

আর ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে ইচ্ছা না করিয়া সতী অন্নপূর্ণা সমভিব্যাহারে পুরীধামাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে অন্নপূর্ণার পিতা কন্যা স্থানান্তরে নীত হইতেছে দেখিয়া, বাসুদেব মহাপাত্রকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। বাসুদেব মহাপাত্র বহুসংখ্যক সৈন্য সহ রঘু ও অন্নপূর্ণার গন্তব্যপথে উপস্থিত হইয়া অন্নপূর্ণাকে বলপূর্ব্বক গৃহে লইয়া যাইয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, সংকল্প করিলেন। পতিপরায়ণা অন্নপূর্ণা আপতিত বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য কায়মনোবাক্যে জগন্নাথদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং রঘু একাকী এরূপ অসহায় অবস্থায় কিরূপে তদনুগামিনী অন্নপূর্ণাকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন ভাবিয়া দুশ্চিন্তাবশে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। অনন্তর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলিত হইয়া আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য ভক্তিভরে জগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ভক্তবৎসল জগন্নাথ ভক্তের প্রার্থনা অবহেলা করিতে পারিলেন না, স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে সৈন্য সহ শত্রু সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব মহাপাত্র স্বীয় সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা নবাগত সৈন্য সংখ্যার আধিক্য বুঝিতে পারিয়া পলায়ন করিল। ভক্তাধীন ভগবান স্বয়ং ভক্ত রঘু এবং তদ্গত প্রাণা সতী অন্নপূর্ণাকে পথ প্রদর্শন করিয়া পুরীধামে লইয়া গেলেন। তাঁহারা নিরাপদে জগন্নাথ মন্দিরের পার্শ্বে অবস্থান করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান "দক্ষিণ পার্শ্ব মঠ" রঘু অর্চ্চিতের মঠ বলিয়া খ্যাত।

শেষ বয়সে রঘু জগন্নাথপদে অবহিত চিত্ত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময় একদিন কতকগুলি সন্ন্যাসী অতিথিরূপে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। আহারীয় দ্রব্য গৃহে এমন কিছু নাই যে সন্ন্যাসীগণকে প্রদান করিয়া আতিথ্য সৎকার করিবেন, অগত্যা অন্নপূর্ণাকে স্বীয় অলঙ্কার প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া আহারীয় সংগ্রহ করিতে বলিলেন, কিন্তু তাহাতে আহারীয় প্রদান করিতে কেহই স্বীকার করিল না; অবশেষে জনৈক মহাজন তাঁহার সকাশে রতিদান ভিক্ষা চাহিয়া আহারীয় দিতে স্বীকৃত হইল। অন্নপূর্ণা ফিরিয়া আসিয়া স্বামীকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন। স্বামী অতিথি সৎকার না হইলে পাপে নিমগ্ন হইবেন মনে করিয়া স্ত্রীকে মহাজন-প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া আহারীয় দ্রব্য আনিতে আদেশ

করিলেন। অন্নপূর্ণা মহাজনের প্রার্থিত ব্যাপারে নিজ সম্মতি জানাইয়া অতিথি সৎকারের যাবতীয় আহার্য্য দ্রব্য তাহার গ্রহণ করিয়া মহাজনকে সন্ধ্যার সময় তাঁহার আবাসে আসিতে বলিলেন। সন্ন্যাসীগণকে চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সুমিষ্ট খাদ্যাদি ভোজন করাইয়া রঘু ও তাঁহার স্ত্রী নিরতিশয় তৃপ্তিলাভ করিলেন। এদিকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহাজন অন্নপূর্ণার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং রঘু, পত্নীকে তাহার প্রতি যত্ন প্রকাশ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। সতী অন্নপূর্ণা আপন শয্যা উপরে উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"আম ভরসা নরহরি
দ্রৌপদী লজ্জা-রক্ষাকারী"

অনন্তর রঘুপত্নী মহাজনকে শয্যার উপরে আসিতে অনুমতি করিলেন। মহাজন শয্যার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল যে স্বয়ং জগন্নাথদেব সতী অন্নপূর্ণাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। দেখিয়াই মহাজনের জ্ঞান সঞ্চার হইল। অনন্তর মহাজন তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া "মাতঃ, আমাকে ক্ষমা করুন" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। রঘু প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই দৃশ্য দর্শনে যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া একান্ত ভক্তিপ্লুত ভাবে জগন্নাথদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন। নারায়ণ ভক্তকে এবং সতী স্ত্রীকে চিরকাল এইরূপেই রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহাতেই তাঁহার মহিমা সুপ্রকট!

১৪। দধি ভক্ষণ।

পুরীরাজ কাঞ্চিপুরের রাজার সহিত যুদ্ধে প্রথম পরাজিত হয়েন। অনন্তর একান্ত হতাশ অবস্থায় ভগবৎ-কৃপালাভ প্রত্যাশায় জগন্নাথদেবের মন্দিরে তিনদিন অনশনে ভূপতিত থাকিলে, জগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশ হয় "এইবার যুদ্ধে যাও, জয়ী হইবে।" দেবাদিদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পুরীরাজ পুনরায় যুদ্ধ আয়োজন করিয়া কাঞ্চিপুরাভিমুখে গমন করিলেন। ভৃত্যের সাহায্য জন্য মহাপ্রভু স্নেহ পরবশ হইয়া ছদ্মবেশে যোদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া বলদেব সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। পরে একটী গোপনারী দধিভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া যাইতেছে দর্শন করিয়া তাঁহাদের বৃন্দাবনের কথা মনে পড়িয়া গেল। অনন্তর তাঁহারা

সেই গোপনারীর নিকট হইতে দধি ক্রয় করিয়াছিলেন। গোপিনী দধির মূল্য চাহিলে তাঁহারা বলিলেন "আমরা রাজসেনাপতি, আমাদের নিকট অর্থ নাই, আমাদের রাজা পশ্চাতে আসিতেছেন; তাঁহাকে আমাদের এই অঙ্গুরীটী দেখাইও, তিনি তোমাকে দধির মূল্য দিবেন" এই বলিয়া অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরী উন্মোচন করিয়া গোপিনীকে প্রদান করিলেন।

গোপিনী স্ত্রীলোক হইয়া রাজার নিকট কিরূপে মূল্য আনিতে যাইবে ভাবিয়া স্বামীকে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানাইল। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে রাজাকে অভিবাদন করিয়া দধি ক্রয়ের ব্যাপার নিবেদন করিয়া তাঁহাকে সেই অঙ্গুরীটী দেখাইল। পুরীরাজ গোপিনী প্রদত্ত অঙ্গুরী দেখিয়া তাহা মহাপ্রভুর হস্তের স্বর্ণাঙ্গুরী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন মহাপ্রভুই সৈন্যগণের সেনাপতি হইয়া যাইতেছেন এবং তিনি চাতুরী করিয়া দধি ভক্ষণ করিয়াছেন। রাজা আনন্দে আত্মহারা হইয়া গোপবধূকে 'কি পাইলে তিনি সন্তুষ্ট হয়েন, জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপিনী বিনয় পূর্ব্বক গোচারণের জন্য কিঞ্চিৎ ভূমি ভিক্ষা করিল। তদনুসারে রাজা তাঁহাকে যথেষ্ট পরিমাণে ভূমি দান করিয়া কাঞ্চিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য যে কাঞ্চিরাজ এবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। অনন্তর পুরীরাজ কাঞ্চিরাজ কন্যাকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত উদ্বাহ সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। গোপিনীর স্বামীর নাম মানিক ছিল। তদনুসারে গোচারণার্থে প্রাপ্ত স্থানের নাম "মানিক পাটন" হইয়াছিল। এই স্মৃতির উন্মেষার্থ পুরীর মন্দিরের ভিতর গরুড়স্তম্ভের নিকট অশ্বারোহী জগন্নাথ ও বলভদ্রের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

১৫। পরমেষ্ঠি শিপুটী।

জগন্নাথভক্ত পরমেষ্ঠি শিপুটী সীবন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদা দিল্লীশ্বর তাঁহাকে দুইটী মস্তকের উপাধান প্রস্তুত করিতে আদেশ করেন। পরমেষ্ঠি উপাধান দুইটী প্রস্তুত করিয়া ভাবিল, এরূপ সুন্দর সামগ্রী মনুষ্যের ব্যবহারে আসা সঙ্গত নহে, জগন্নাথদেবের ব্যবহারেরই ইহা উপযুক্ত! রথযাত্রার সময় উপাধান দুইটী লইয়া পরমেষ্ঠি পুরীধামে উপস্থিত হইলেন এবং পহণ্ডীর উপাধান ছিন্ন হইয়া যাওয়ায়, আপন হস্তস্থিত উপাধানটী জগন্নাথ-সেবকে উপহার প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। রথযাত্রা অন্তে গৃহে

প্রত্যাবৃত্ত হইলে পরমেষ্টির নিকট দিল্লীশ্বরের সিপাহী আসিয়া রাজাদিষ্ট উপাধান দুইটী চাহিল; কিন্তু তন্মধ্যে একটী উপাধান দিতে অক্ষম হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে নীত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন অপর উপাধানটী কোথায়, পরমেষ্টি উত্তর করিলেন, তিনি তাহা জগন্নাথদেবকে উপহার দিয়াছেন। রাজা বিশ্বাস না করিয়া তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিলেন। পরমেষ্টি অনশনে থাকিয়া জগন্নাথদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু কারাগারে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহার কুব্জদেহ সরল করিয়া দিলেন। রাজার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল, 'পরমেষ্টি যাহা কহিয়াছে সমস্ত সত্য'। পরদিন রাজা কারাগৃহে বন্ধনমুক্ত পরমেষ্টিকে দেখিতে আসিলেন এবং তাঁহার কুব্জদেহ সরল হইয়াছে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি পরমেষ্টির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে নানাবিধ উপহার সম্ভার সহ বিদায় দিলেন এবং এই বিস্ময়াবহ ব্যাপারের জন্য ভক্তিভরে জগন্নাথপদে কোটি কোটি প্রণাম করিতে লাগিলেন।

১৬। বিষ্ণুপ্রিয়া।

মহাপ্রভুর সেবিকা বিদুষী বিষ্ণুপ্রিয়া পুরুষোত্তমের নিকটস্থ কোনও গ্রামে বাস করিতেন। বন্ধু মহাপাত্র নামক জনৈক পাণ্ডা সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসীগণকে বলিল "তোমাদের যাহা যাহা জগন্নাথদেবকে উপহার দিবার ইচ্ছা, আমার নিকট তাহা দিতে পার।" বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিলেন মহাপ্রভু ত জগৎবাসীর যাবতীয় অভাব পূরণ করেন, তাঁহার কিসের অভাব যে তৎপূরণার্থ তাঁহাকে উপহার দিব? মণিমুক্তা রত্নে তাঁহার প্রয়োজন নাই, এই ভাবিয়া একটী শ্লোক রচনা করিয়া, বন্ধু মহাপাত্রকে তিনি বলিলেন এই শ্লোকটী দেবাদিদেবের পদে উপহার স্বরূপ অর্পণ করিও এবং সেই সঙ্গে দশটী মুদ্রা মহাপাত্রকে দিয়া বলিলেন, এই মুদ্রা তোমার পারিশ্রমিক স্বরূপ গ্রহণ করিবে। বন্ধু মহাপাত্র পথে যাইবার সময় সেই শ্লোকটী ছিন্ন করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং প্রাপ্ত দশটী মুদ্রা লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অন্তর্যামী জগন্নাথদেব ভক্ত-প্রেরিত সেই ছিন্ন শ্লোকটী সংগ্রহ করিয়া আপন গলদেশে বাঁধিয়া রাখিয়া বন্ধু মহাপাত্রকে স্বপ্নাদেশ করিলেন, 'তুমি তোমার প্রাপ্যটী আনিলে, কিন্তু আমার প্রাপ্যটী ফেলিয়া দিয়া আসিলে? আমি আমার প্রাপ্য

শ্লোকটী আনিয়া আমার গলদেশে রাখিয়াছি, তুমি অবিলম্বে সুবর্ণ পদক প্রস্তুত করিয়া দিবে, আমি তাহার মধ্যে শ্লোকটী সন্নিবেশিত করিয়া তাহা অলঙ্কার স্বরূপ গলদেশে ধারণ করিব।" ইহাতে বন্ধু মহাপাত্রের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল এবং নিজ দুষ্কৃতির জন্য জগন্নাথ পদে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আদেশ মত সুবর্ণ পদক প্রস্তুত করিয়া তাহা জগন্নাথদেবের গলদেশে অর্পণ করিয়াছিলেন।

১৭। নীলাম্বর দাস।

নীলাম্বর দাস বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া পুরুষোত্তম যাইবার মানস করিয়াছিলেন। পথে, যে ধীবরের নৌকায় তিনি গঙ্গাপার হইতেছিলেন, সেই ধীবর তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইয়া তাঁহার প্রাণবধ করিবে মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়াছিল। নীলাম্বর ধীবরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া জগন্নাথদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভক্তের প্রাণরক্ষার জন্য জগন্নাথ স্বয়ং গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া নীলাম্বরের প্রাণরক্ষা করিলেন। নীলাম্বর পুরুষোত্তমে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রথযাত্রায় মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার পরেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটিয়াছিল।

১৮। গণপতি ভট্ট।

গণপতি ভট্ট জগন্নাথদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। সংসার-তাপদগ্ধ জীবের চিরমুক্তিদাতা দেবাদিদেবের চরণদ্বয় দর্শন অভিলাষে তিনি পুরীধামাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। পথে আঠার নালার নিকট অবস্থিতি করিয়া জগন্নাথ-মন্দির হইতে প্রত্যাগত প্রত্যেক যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাঁহারা মন্দিরে দারুব্রহ্মের কিরূপ রূপ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন? সকলেই জগন্নাথ-দেবের রূপ বর্ণনা করিয়া সেই মনোহর রূপ দর্শন করিয়া আসিয়াছে বলিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনে তৃপ্তির সঞ্চার হইল না। তাঁহার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে জগন্নাথদেব স্বয়ং ব্রহ্ম, ব্রহ্মকে দর্শন করিলে মানবের মুক্তি হইবে; কিন্তু যাঁহারা দর্শন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের কাহারও তাহা হইলে মুক্তিলাভ ঘটে নাই। এতদবস্থায় জগন্নাথদেব নিশ্চয়ই শ্রীমন্দিরে নাই, সুতরাং ব্রহ্ম দর্শনও আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, এই চিন্তা করিয়া বিষ ভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিবেন কৃত সঙ্কল্প হইলেন। ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না। জগন্নাথদেব ব্রাহ্মণ বেশে গণপতিকে

দর্শন দিয়া বলিলেন 'স্নানযাত্রার দিন জগন্নাথদেবকে দর্শন করিও, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে'। গণপতি ভট্ট ব্রাহ্মণের আদেশ মত স্নানযাত্রার সময় দারুব্রহ্মকে দর্শন করিলেন কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মনের সন্দেহ অপসারিত হইল না। রাত্রে তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল "তুমি গজবদন গণপতি রূপ দর্শন করিতে পাইবে।" অনন্তর গণপতি পুনরায় তাহা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মানবলীলার অবসান হইল।

১৯। দাসিয়া বাউরি (বালিগ্রাম দাস)।

বালিগ্রাম নিবাসী দাসিয়া বাউরি অতিশয় নীচজাতি বলিয়া মন্দিরে গমন করিয়া জগন্নাথ দর্শনে বঞ্চিত। রথযাত্রার দিনে অভীষ্টদেবকে দর্শন করিবার মানসে পুরীযাত্রা করিয়া তিনি দর্শনান্তে গৃহে উৎফুল্ল মনে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে নূতন হাঁড়ীতে অল্প চাউল মধ্যে শাক সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া জগন্নাথদেবের পদ্ম আঁখির রূপ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তাঁহার আর আহার করা ঘটিল না, তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী অন্ন হইতে শাকগুলি পৃথক করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সে অন্ন আহার করিতে পারেন নাই। আহারকালে তিনি মনে মনে জগন্নাথদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। দাসিয়া 'সর্ব্বদা যেন ঐ চরণ দর্শন করিতে পাই এই বর প্রার্থনা করিলেন।

তিনি বস্ত্রের ব্যবসা করিতেন। একদা কোনও লোকের বৃক্ষে নূতন নারিকেল ফলিয়াছে দেখিয়া বস্ত্র বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ বিনিময়ে সেই নারকেলটী ক্রয় করিয়া তাহা জগন্নাথদেবকে উপহার প্রদান করিবেন মনস্থ করিলেন। পথে জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীমন্দিরে পূজা দিতে যাইতেছেন দেখিয়া, দাসিয়া ব্রাহ্মণকে নারিকেলটী দিয়া বলিলেন এই নারিকেলটী, মহাপ্রভুকে নিবেদন করিয়া দিয়া বলিবেন"বালিগ্রাম দাস ইহা প্রেরণ করিয়াছেন"। ব্রাহ্মণ, বাউরির ধৃষ্টতা ভাবিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া অগ্রে আপনার পূজা সম্পন্ন করিলেন, পরে যেমনই তিনি দাসিয়া প্রদত্ত নারিকেলটী অর্পণ করিলেন, অমনই দেবাদিদেব হস্ত প্রসারণ করিয়া সেই পূজোপহার গ্রহণ করিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ চমৎকৃত হইলেন এবং

ভাবিলেন নীচজাতি হইলেও দাসিয়া তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বাউরি, তুমিই ধন্য! ভগবন! ধন্য তব লীলা, ধন্য তোমার মহিমা!

অন্য এক সময়ে দাসিয়া আপন বাড়ীর গাছের কতকগুলি আম্র লইয়া মহাপ্রভুকে পূজার উপহার দিবার জন্য মন্দির সমীপে উপস্থিত হইলে পাণ্ডাগণ উক্ত আম্র তাঁহাদিগের দ্বারা মন্দির মধ্যে প্রেরণ করিবার জন্য দাসিয়াকে বিরক্ত করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন তিনি স্বয়ং ঐ পূজা অর্পণ করিবেন। এই বলিয়া নীলচক্রের দিকে চাহিয়া সাশ্রুপূর্ণ নয়নে জগবন্ধুকে কাতরে ডাকিয়া আম্র অর্পণ করিলেন। ভক্তের প্রতি তাঁহার দয়া অপার, ভক্ত প্রদত্ত আম্রগুলি শূন্যে নীলচক্র অভিমুখে চলিয়া গেল, অনন্তর স্বয়ং জগন্নাথদেব ভক্ত দাসিয়াকে দর্শন দিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সেই আম্র গ্রহণ করিলেন। এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলে বিস্ময়-বিহ্বল অবস্থায় অবাক হইল; দাসিয়াকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। পরদিন পাণ্ডাগণ রত্ন সিংহাসন উপরে আম্রের পরিত্যক্ত আঁটিগুলি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, দাসিয়া, তুমিই শ্রেষ্ঠ। দাসিয়া পাণ্ডাগণের পদে পতিত হইলেন। ভক্ত ভগবৎপদে তদীয় মৎস্য কূর্ম্মাদি রূপ দর্শন কামনা করিয়া প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। দাসিয়ার ও জন্ম সার্থক হইল।

২০। লক্ষ্মীপুরাণ।

জগন্নাথদেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মীদেবী আপন ভক্তগণের গৃহে সর্ব্বদাই গমনাগমন করিতেন। একদা অগ্রহায়ণ মাসের বৃহস্পতিবারে তিনি দেখিতে পাইলেন এক চণ্ডাল গৃহিনী শুদ্ধাচারে গৃহাঙ্গনে গোময় লেপন করিয়া তাহাতে আলিপনা প্রদান করিয়া লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণী এবং চণ্ডালিনীতে কোনও পার্থক্য নাই। তিনি চণ্ডালিনীর ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, প্রতি বৃহস্পতিবারেই তাঁহার গৃহে আগমন করিতেন। একদা বলভদ্রদেব লক্ষ্মীদেবীকে চণ্ডালিনীর গৃহ হইতে নির্গত হইয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জগন্নাথদেবকে বলিলেন লক্ষ্মীদেবী চণ্ডালিনী স্পর্শ দোষে দূষিতা, সুতরাং উঁহাকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিৎ নহে; তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ কর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুযায়ী তিনি প্রিয়তমা পত্নীকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া মন্দির পরিত্যাগ করিতে আদেশ

দিলেন। লক্ষ্মীদেবী অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। অগত্যা লক্ষ্মীদেবী শ্রীমন্দির হইতে নিস্ক্রান্তা হইলেন, কিন্তু গমন সময়ে স্বামীকে অভিসম্পাত করিয়া যাইলেন, "তুমি লক্ষ্মীছাড়া অবস্থায় দরিদ্র থাকিবে, অন্ন যুটিবে না এবং আবার এই চণ্ডালিনী স্পৃষ্ট অন্ন আহার করিয়া তোমার ক্ষুধার শান্তি হইবে, তাহাতেই তোমার দারিদ্র্য মোচন হইবে।" তাঁহার যাবতীয় পরিচারিকা সমভিব্যাহারিণী হইল; এতগুলি প্রতিপাল্য সঙ্গে লইয়া পিতৃগৃহে গমন করা সঙ্গত নহে মনে করিয়া তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার বাসোপযোগী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। ক্ষণমধ্যে সিংহদ্বার লাঞ্ছিত সুচারু হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইল, এবং লক্ষ্মীদেবী তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীত্যাগের প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য তিনি প্রথমেই বেতাল তাল দ্বারা শ্রীমন্দিরের যাবতীয় আহারীয় দ্রব্য এবং ধান্য চাউল ইত্যাদি তথা হইতে অপসারিত করাইয়া তাহা নিজের নিকটে আনাইলেন। এদিকে বলভদ্র এবং জগন্নাথদেব, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ভাণ্ডার অন্বেষণে যাইয়া দেখিলেন তথায় আহার্য্য কিছুই নাই। অগত্যা তাঁহারা মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্যত্র অন্ন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানেই গমন করেন, সেখানেই লোকে চোর মনে করিয়া তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদেরই পূজক বড় পাণ্ডার গৃহে যাইয়া প্রথমে পাণ্ডাজননী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়েন, পরে পাণ্ডা তাঁহাদিগকে সামান্য ভিক্ষুকদ্বয় মনে করিয়া অন্ন আহার করাইবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু রন্ধনান্তে পরিবেষন সময়ে হাঁড়ী পর্য্যন্ত নাই দেখিয়া পাণ্ডা তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। জঠর জ্বালায় কাতর হইয়া তাঁহারা "কবিরসাহিতে" গমন করিলেন; তথায় আহারার্থ কিছু লাজ সংগৃহীত হইল, কিন্তু আহার সময়ে লক্ষ্মীদেবীর অনুমতিক্রমে পবনদেব সেগুলি উড়াইয়া লইয়া গেলেন। গন্তব্য পথে একটী পদ্মপুষ্প-পূর্ণ পুষ্করিণী ছিল, তাহা হইতে পদ্মবীজ আহরণ করিয়া আহার করিবেন মানসে পুষ্করিণীর জলে অবতরণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দুরদৃষ্ট ক্রমে তখনই পুষ্করিণীর জল পঙ্কে পরিণত হইল। তখন তাঁহারা এক যোগী অন্ন রন্ধন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার নিকট অন্ন ভিক্ষা করিলেন। যোগী দুগ্ধ মিশ্রিত অন্ন ভিক্ষুকদ্বয় সমীপে স্থাপন করিবামাত্র তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল

দেখিয়া বলিলেন তোমরা লক্ষ্মীছাড়া, তোমাদের অন্ন মিলিবে না। অবশেষে দূরে একটী সুরম্য প্রাসাদ দেখিয়া সেখানে গমন করিলে নিশ্চয়ই কিছু আহার্য্য মিলিতে পারে মনে করিয়া তথায় গমন করিবেন মনস্থ করিলেন। লক্ষ্মীদেবীর আজ্ঞায় সূর্য্যদেব বালুকারাশি এত উত্তপ্ত করিলেন যে তাঁহারা দুঃসহ ক্লেশ ভোগ অবসানে সেই প্রাসাদ দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র লক্ষ্মীদেবীর পরিচারিকাগণ তাঁহাদিগকে বলিলেন "এইরূপ একজন ব্যক্তি আমাদিগের কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন, আপনাদের এখানে কিছু ভিক্ষা পাইবার আশা নাই, আপনারা চলিয়া যাউন।" তখন তাঁহাদের উভয়ের আর চলচ্ছক্তি নাই, কাতরে অন্ন ভিক্ষা করিলেন। লক্ষ্মীদেবী সংবাদ প্রেরণ করিলেন,'ইহা চণ্ডালিনীর গৃহ, এখানে ব্রাহ্মণ কিরূপে ভক্ষণ করিতে পারে?' বলভদ্র বলিলেন চণ্ডালিনীর গৃহে তাঁহারা পাক করিয়া আহার করিবেন, সুতরাং তাহাতে কোনরূপ দোষ হইবে না। লক্ষ্মীদেবীর আদেশে দাসীগণ রন্ধনের হাঁড়ী, কাষ্ঠ, চাউল ইত্যাদি উপকরণ আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে রন্ধন করিতে বলিল। খাদ্য সম্ভার দেখিয়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। জগন্নাথদেব প্রথমে রন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু সহস্র সহস্র ফুৎকার দিয়াও অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারিলেন না, কারণ পদ্মালয়া পূর্ব্বেই অগ্নি-স্তম্ভন করিয়াছিলেন। জগন্নাথদেব অকৃতকার্য্য হইলে বলভদ্র 'ইহা তোমার কার্য্য নহে, আমি অচিরেই রন্ধন কার্য্য সমাপন করিতেছি' এই আস্ফালন করিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিয়া রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু সহস্র চেষ্টা সত্বেও জল সামান্য উত্তপ্ত করিতেও সমর্থ হইলেন না। রোষে ও ক্ষোভে হাঁড়ী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া তিনি পাকশালা হইতে বহির্গত হইলেন। অনশনে ও পথশ্রমে উভয়েরই এক্ষণে এমত অবস্থা হইয়াছে, যে অতি নীচজাতিও যদি সে সময় তাঁহাদিগকে অন্ন প্রদান করে, তাহাও সাদরে গ্রহণ করিয়া আহার করিতে তাঁহারা প্রস্তুত। উভয়েই তখন পরিচারিকাগণকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমাদের গৃহকর্ত্রীকে দয়া প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কিঞ্চিৎ অন্ন দিতে বল।" গৃহকর্ত্রী বলিয়া পাঠাইলেন "আমি চণ্ডালিনী আমার স্পৃষ্ট অন্ন আহার করিলে, তাঁহারা পতিত হইবেন"। এরূপ বলা সত্বেও ব্রাহ্মণদ্বয় কাতরে অন্ন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীদেবী সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন,

আজ তাঁহার স্বামী ও ভাসুর তাঁহার দ্বারা পাচিত অন্ন আহার করিবেন ইহাতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তিনি নানাবিধ চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় প্রস্তুত করিয়া সাদরে তাঁহাদের আহারের ব্যবস্থা করিলেন। দুই ভাই দুইখানি আসনে উপবেশন করিলে বলরামের সম্মুখে থালা পরিপূর্ণ অন্ন ব্যঞ্জন রাখিয়া পাচিকা জগন্নাথ-দেবের জন্য অন্নথালা পাকশালা হইতে আনিতে গিয়া পুনরায় আসিয়া দেখিল বলরাম চারিগ্রাসে সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। লক্ষ্মীছাড়া হইলে এইরূপই হইয়া থাকে ভাবিয়া, তিনি দুই ভাইকে চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় সর্ব্বরকম দ্রব্য পরিবেশন করিলেন। জগন্নাথ অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহার করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন, এরূপ সুস্বাদু আহারীয় লক্ষ্মী ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর নহে। এই স্ত্রীলোকই আমার লক্ষ্মী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরস্পরের পরিচয় হইলে জগন্নাথদেব লক্ষ্মীর নিকট নিজ দুষ্কৃতির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। বলভদ্রদেবেরও তখন চৈতন্য উদয় হইয়াছিল। তিনিও লক্ষ্মীদেবীকে সযতনে শ্রীমন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। লক্ষ্মীদেবী তখন জগন্নাথদেবকে বলিলেন আমার অভিশাপ বাণী সফল হইয়াছে। আপনারা চণ্ডালিনীর অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে সত্য করুন যে—

"চণ্ডাল ব্রাহ্মণ যার খিয়াখেই হবে,
সমস্তে খাই হস্ত জলে না ধুইবে,
হাড়ীর হস্ত ব্রাহ্মণে ছাড়ই খাইবে,
ব্রাহ্মণে খাইয়া হস্ত মুণ্ডেরে পুঁছিবে,
অন্ন খাই সর্ব্বে মুণ্ডে পঁছুথিবে হস্ত,
তেবে বড় দেউলকু জিবি জগন্নাথ।"

এইরূপ সত্যে অবদ্ধ হইলে তবে আমি শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিব, নতুবা এই স্থানেই থাকিব। জগন্নাথদেব "তথাস্তু" বলিয়া সাদরে লক্ষ্মীদেবীকে মন্দিরে আনয়ন করিলেন।

লক্ষ্মীপুরাণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে—

"গুরুবারদিনে যে এ পুরাণ শুনিব,
জন্ম জন্মান্তর তার পাপ খিয়া জিব।"

মাহেশ লীলা।

কথিত আছে, শ্রীরামপুরের নিকট মাহেশ নামক স্থানে জগন্নাথদেব গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলেন। উৎকলীয় ব্রাহ্মণগণ এসম্বন্ধে, যে গান গাহিয়া বঙ্গদেশের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

জগন্নাথের ভাবে ভব, সিন্ধু হবে পার,
দরশনে গেলে অন্তে, পাপ থাকেনা আর।
দয়াল ঈশ্বর সেযে, প্রভু ভগবান।
বিচারিল আজি আমি, ক'রব গঙ্গাস্নান।
দাঁতন করিতে প্রভু, মনে বিচারিল,
দাঁতন সারিয়া প্রভু, চলিতে লাগিল।
মাহেশেতে আছে কালী, ময়রার দোকান,
সেই ঘাটে গিয়া আমি, ক'রব গঙ্গাস্নান।
ডুব দিয়া গঙ্গাস্নান, ক'রলেন গঙ্গাজলে,
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণরূপ ধ'রলেন কুতুহলে।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বেশ, ধ'রলেন নারায়ণ।
প্রবেশ হ'লেন গিয়ে, ময়রায় দোকান।
ব্রাহ্মণ বলেন শুন, ওহে ময়রা ভাই,
খাবার কিছু দেও, আমি জল খেয়ে যাই।
ময়রা বলে কি খাবার, দিবহে ঠাকুর?
ব্রাহ্মণ বলেন দাও, সন্দেশ মতিচুর।
খাবার ওজন ক'রে, ব্রাহ্মণ-হাতে দিল,
হাত পেতে নিয়ে প্রভু, চলিতে লাগিল।
ময়রা বলে শুন শুন, ব্রাহ্মণ ঠাকুর,
দাম নাহি দিয়া যাও, কোথাকার চোর?
ফিরিয়া ব্রাহ্মণ বলে, শুন ময়রা তুমি,
কাছে পয়সা নাই কাল, দিয়া যাব আমি।
ময়রা বলে ওহে ঠাকুর, কে চিনে তোমারে?

খাবার ফিরায়ে দিয়ে, যাও চ'লে ঘরে।
একথা শুনিয়া প্রভু, মনে বিচারিল,
সুবর্ণের দুটী বালা, ময়রার হাতে দিল।
ঠাকুর বলেন তবে, বালা রাখ তুমি,
কড়ি যখন দিব বালা, নিয়ে যাব আমি।
একথা বলিয়া প্রভু, হইল অন্তর্ধান,
নিম বৃক্ষেতলে প্রভু, করিল জলপান।
গঙ্গাজল খেয়ে প্রভু, হরষিত মন,
উড়িষ্যাতে শ্রীমন্দিরে করিলেন গমন।
কে চিনিতে পারে সেই গোবিন্দের বেশ?
উড়িষ্যাতে শ্রীমন্দিরে করিলেন প্রবেশ।
স্নান পূজা সারিবারে, আইল পাণ্ডাগণ,
দরজা খুলিয়া দিল, পূজারি ব্রাহ্মণ,
মনের হরষে পাণ্ডা, পূজে জগন্নাথে,
সুবর্ণের দুটী বালা, না দেখিয়া হাতে।
দড়ি দিয়া জগন্নাথে করিয়া বন্ধন,
একে একে প্রহার, করিল সর্ব্বজন।
কিছু না বলিয়া প্রভু, দিবসের পাকে,
নিশিকালে স্বপ্ন এক, দেখাল পাণ্ডাকে।
মাহেশেতে গিয়াছিনু, করিবারে স্নান,
বন্ধক রাখিয়া বালা, খেয়েছি জলপান।
তোমরা সকল পাণ্ডা, যাও মাহেশেতে,
কড়ি দিয়া স্বর্ণবালা, আনহে ত্বরিতে।
একথা শুনিয়া পাণ্ডা, হরষ অন্তরে,
কেমনে চিনিব বালা, বলিব কাহারে?
জগন্নাথ বলে পাণ্ডা, হ'ও সাবধান,
মাহেশে উত্তরদিকে, আছে এক দোকান,
কালীশঙ্কর নামে ময়রা, আছে একজন,

চ্যাঙ্গা হেন গুম্ফ আছে, গৌর বরণ।
দিবানিশি দোকান তার, থাকে সদা খোলা,
তথা গেলে পাবে তুমি, সুবর্ণের বালা।
সে কথা শুনিয়া পাণ্ডা, হরষিত মন,
প্রভাতে উঠিয়া পাণ্ডা, সাজে দশজন।
ঢাক ঢোল শঙ্খ আদি, বাদ্য বাজাইল,
বালা আনিবারে পাণ্ডা, গমন করিল।
এক পাণ্ডা বলে তবে, শুন সর্ব্বজন,
নিমেতে চম্পক ফুটে, কিসের কারণ?
একথা শুনিয়া সর্ব্বে দেখিতে লাগিল,
নিমগাছে চম্পাফুল, প্রত্যক্ষে দেখিল।
যেইখানে চম্পাফুল, নিম বৃক্ষ ডালে,
পাণ্ডাগণ উত্তরিয়া, ময়রা-পোকে বলে,
পাণ্ডা বলে ওহে ময়রা, কি নাম তোমার?
ময়রা বলে কালীশঙ্কর, নামটী আমার।
দড়ি দিয়া বান্ধিল, ময়রাকে অতঃপর,
কি কারণে বান্ধ তুমি, কি করনু তোমার?
পাণ্ডা বলে ময়রা তোর, দর্প এত দূর,
জাননাকি এসেছিল, ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর?
একথা শুনিয়া ময়রা, ভাসে অশ্রুজলে,
চেতনা পাইয়া ময়রা, পড়ে পদতলে।
পাণ্ডাবলে ঠাকুর ব'লে, যদি চিন্‌তে পার,
সুবর্ণের দুটী বালা, দেওহে তাহার।
ময়রা বলে বালা আমি না দিব তোমারে,
বালা নিয়ে দিব আমি, ঠাকুর হস্তেরে।
পাণ্ডা বলে ওহে ময়রা, কি বলিব তোরে,
বালা নিয়ে শীঘ্র চল, আমার সঙ্গেরে।
বালা নিয়ে ময়রা তবে, পাণ্ডা সঙ্গে গেল,

উড়িষ্যাতে শ্রীমন্দিরে, প্রবেশ করিল।
হাতে করি দুটী বালা, যোড় করি কয়,
অপরাধ ক্ষমা করি, দেও পরিচয়।
যদি মোরে পরিচয় না দিবে আপনি,
গলায় মারিয়া ছুরি, মরিব এখনি।
ময়রার ভক্তি দেখি, প্রভু হাত বাড়াইল,
ময়রা লইয়া বালা ঠাকুর হাতে দিল।
বালা পেয়ে ময়রাকে, কোলে করি নিল,
কোলে করে নিতে ময়রা বৈকুণ্ঠে চলিল।
বালা বন্ধকের কথা, শুন সর্ব্বজন,
শুনিলে শরীরে পাপ, না থাকে কখন,
বালা পেয়ে পাণ্ডা সব, হরষিত মন,
এ অবধি কৃষ্ণর বালা-বন্ধক বিবরণ॥

—:•:—

প্রসাদ মাহাত্ম্য।

উৎকালবাসী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগণ প্রসাদ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে ছড়া গান করে তাহা লিখিত হইল—

একদিন একাদশী, ক'রলে বিশ্বনাথ,
গৌরী বলে ঘরে নাই, কি খাবে প্রসাদ?
হেনকালে কৈলাসেতে, আইল নারদ,
করে বীণা যন্ত্র বাজে রাম নামের পদ।
শূলপাণি বলে, বাছা! শুনরে ভাগিনা,
প্রভুর প্রসাদে আজি, করিব পারণা।
শুনিয়া নারদমুনি, শীঘ্র এনে দিল,
উঠিয়া দু'হাত পাতি, সদাশিব নিল।
আধেক কৈবুল্য তার, ফেলাইল মুখে,
আর কণিকায় ল'য়ে, রাখিল মস্তকে।

আনন্দে নাচিয়া, বলেন গিরিবাসী,
আজ আমার ব্রত পুণ্য, কোটি একাদশী।
গৌরী বলেন হেবা, ভোলা মহেশ্বর!
কা'র এঁঠ ভাত রাখ, জটার ভিতর?
তোমা চাহি দেব! আর, বড় কেবা আছে?
ত্রিলোকের নাথ প্রভু! বল আমার আছে!
গিরিশ বলেন, গৌরী! তোমার প্রত্যক্ষে,
চল গৌরী দেখাইব নীলাচলে চক্ষে।
নন্দী সঙ্গে চল গৌরী হর মনোরথে,
মিছা মায়া জগবন্ধু পাতিলেন পথে,
কালিয়া কুক্কুর হ'য়ে প্রভু ভগবান,
প্রভুর প্রসাদ মুখে আগু আগু যান।
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তার পিছে গুড়াইয়া,
বদনে দু'হাত পাতে খান ছাড়াইয়া।
তার যত অবশিষ্ট পড়ে মহীপর,
একটী একটী ক'রে খায় দিগম্বর।
ঘৃণা করি গৌরী মনে ভাবে বারবার,
অনাচারী বিশ্বনাথ ঠাকুর আমার।
বিভূতি মাখিয়া অঙ্গে যোগীন্দ্র বলাও,
কুক্কুর উচ্ছিষ্ট ভাত হাসিমুখে খাও?
ছিছি! ক'রে গৌরীদেবী গালে দিল কর
কি কর্ম্ম করিলে তুমি ভোলা মহেশ্বর?
শুনি কি বলিবে তোমা অমর নিবাসী?
উড়িষ্যায় কি কারণে জাতি দিলে আসি?
ইহা শুনি শূলপাণি কর্ণে দিল হাত,
নীলাচলে ভেটিলেন ঠাকুর জগন্নাথ।
শিঙ্গা জয় ডম্বর, বাজাইয়া গাল,
নেচে নানা ভঙ্গি ক'রে গলে হাড়মাল,

আনন্দে বড় দেউলে ধ্বজা নেতা উড়ে
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তার করে হাত জুড়ে
চণ্ডাল ব্রাহ্মণ মুখে তুলে দেয় ভাত
সহস্র লোচন ইন্দ্র দেখে পাতে হাত,
এ সব দেখিয়া বলেন ভগবতী,
প্রভু চরণে তবে করিনু প্রণতি।
গায় দ্বিজ কবিকর্ণ শিরে দিয়া হাত
চরণে শরণ লই রাখ জগন্নাথ।

(সমাপ্ত)

পরিশিষ্ট

জগন্নাথদেবের সেবাপূজা।

(সামান্য বিধি।)

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে প্রত্যহ সেবকগণ শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রভুর মঙ্গলারতি সম্পন্ন করেন। তখন ভক্ত বৈষ্ণব ও বৈতালিকবৃন্দ ঘণ্টামর্দ্দল করতাল ধ্বনি দ্বারা শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে জগন্মোহন-মণ্ডপে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করিতে থাকেন এবং সে সময়ে দেশবিদেশাগত ধার্ম্মিক দর্শকবৃন্দ স্তুতি প্রণামাদি-সহযোগে আত্মনিবেদনব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন। পূর্ব্বরাত্রের 'বড়-শৃঙ্গার'-বেশ অবস্থায় মঙ্গলারতি ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

অনন্তর 'অবকাশ' অর্থাৎ প্রভুর দন্তধাবন, স্নান প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই অবকাশাবসরে প্রভুকে নূতন বেশ-শোভিত করা হয়, তাহার পরে "বল্লভ" ভোগের অনুষ্ঠান ও তদনন্তর 'সকালধূপ' নামে পূর্ব্বাহ্ণ ভোগের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

শ্রীজগন্নাথদেবের পূজায় অষ্টাদশাক্ষর গোপাল মন্ত্র, বলদেবের বাসুদেব মন্ত্র এবং সুভদ্রাদেবীর পূজায় ভুবনেশ্বরী মন্ত্রের বিনিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

অনন্তর পূর্ব্ববেশ অপসারিত করিয়া প্রভুকে নূতন বেশ-শোভিত করা হয়। তৎপরে দ্বিপ্রহরধূপ বা মধ্যাহ্নধূপের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

প্রাতের ও দ্বিপ্রহরের এই উভয় বিধ "ধূপের" মধ্যবর্ত্তী সময়ে প্রত্যহ 'ভোগমণ্ডপে' 'ছত্রভোগ' নামে প্রসিদ্ধ ভোগ-বিশেষের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। অন্যান্য ভোগ সিংহাসনের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু এই ছত্রভোগ 'ভোগ মণ্ডপেই' সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে সমস্ত পর্ব্বাদি উপলক্ষে যাত্রীর সংখ্যা অত্যধিক হইয়া পড়ে, অথবা কোনও দানশীল মহাত্মার যে সময় বিস্তর

মহাপ্রসাদের প্রয়োজন হয়, সেই সময় দ্বিপ্রহর ধূপের পরেও আর এক ভোগমণ্ডপ-ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে; তাহা "পছ মণ্ডপ-ভোগ" বলিয়া অভিহিত।

মধ্যাহ্নধূপ ক্রিয়ার অবসানে মহাপ্রভুর 'পঁহুড়' (দিবানিদ্রা) এবং তদনন্তর সন্ধ্যার সময় প্রভুর নূতন বেশ অনুষ্ঠান অন্তে 'সন্ধ্যা আরতি' ও 'সন্ধ্যাধূপ' সম্পাদিত হয়। দ্বিপ্রহরধূপে দধ্যন্ন ও মাঠপুলির ব্যবস্থা আছে। সন্ধ্যাধূপে ভাত, ডাল, নানাবিধ ব্যঞ্জন ও বিবিধ পিষ্টকের আয়োজন থাকে।

অনন্তর প্রভুর শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন ও নানাবিধ সুবাস-সুন্দর কুসুম মালার মণ্ডন ব্যাপার সম্পাদিত হয়। ইহারই নাম বড় শৃঙ্গার বেশ। প্রভুর এই বেশই ভক্তজনের নিতান্ত মনোমুগ্ধকর।

বড়সিংহার বেশ অন্তে আর একটী ভোগ দেওয়া হয়, তাহার নাম 'বড়সিংহার ভোগ।' ইহাতে প্রক্ষালিতান্ন ও শাক এবং নানাবিধ পিষ্টকের ব্যবস্থা থাকে। অনন্তর প্রভুর শয্যারচনা করা হয়, এবং তদুপরি রাম ও কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি শায়িত হন। সেই সময় একটী আরতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় এবং "ভিতর-গায়নী" নাম্নী দেবদাসীগণ সুস্বরে 'গীতগোবিন্দ' গান করিয়া থাকেন। পরে প্রভুর মন্দিরের দ্বাররুদ্ধ হয় এবং মন্দির "শোধ" অর্থাৎ শ্রীমন্দিরে সে রাত্রির মত এককালে জনসমাগম-শূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

মন্দিরের ম্যানেজার।

জগন্নাথ মন্দিরের বর্ত্তমান ম্যানেজার রায় সাহেব গৌরশ্যাম মহান্তি পুরী সহরেরই কুন্ধাই বেণ্টসাহি নামক পল্লীর অধিবাসী। ইঁহার পিতা বাবু অনন্ত চরণ মহান্তি 'ভক্তিরত্ন' পরমবৈষ্ণব এবং পুরীর একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইংরাজি ১৮৯৫ সালে ইনি কটক রাভেন্সা কলেজ হইতে B.A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৭ সালে সব্ একজিকিউটিভ্ সারভিস্ গ্রহণ করেন এবং কটক, কেন্দ্রাপাড়া ও যাজপুরে সব্‌ডেপুটী পদে এবং তৎপরে নিমাপাড়া খাস মহলের তহসিলদার পদে কার্য্য করিয়া সাতিশয় সুখ্যাতিলাভ করেন। ১৯০৪ হইতে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ৯ বৎসর তিনি 'নয়াগড়' নামক অর্দ্ধস্বাধীন রাজ্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া ছিলেন। ১৯১২ সালে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায়সাহেব উপাধিতে ভূষিত করিয়া

গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দেন। ১৯১৩ সালের ১২ই মে তারিখে ইনি জগন্নাথ মন্দিরের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার উপযুক্ত পাত্রেরই উপর ন্যস্ত হইয়াছে। নিয়োগ সময় হইতেই তিনি মন্দিরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কল্পে বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছেন।

মুক্তি-মণ্ডপ।

মন্দিরের অন্তর্প্রাঙ্গণ মধ্যে দক্ষিণ পার্শ্বে যে, একটী বেদী দৃষ্টিগোচর হয় তাহার নাম মুক্তি মণ্ডপ। ইহা 'ব্রহ্মাসন' নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে রাজপূজিত ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা জপ, স্তব-পাঠ প্রভৃতি ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং প্রভুর ভোগাবসানে রাজনিয়োগানুসারে খেচরান্ন প্রভৃতি মহাপ্রসাদের সেবা করিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। দণ্ডী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই মুক্তিমণ্ডপ সভার সদস্য। ভারতের যাবতীয় ভক্ত ও ধর্ম্ম-প্রবণ বিশ্বাসী হিন্দু এই সভার ব্যবস্থাকে বহুমান পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ উৎকলে এই সভার সিদ্ধান্ত ঈশ্বরাজ্ঞারূপে গৃহীত হয়।

লক্ষ্মীদেবীর প্রাঙ্গণে প্রতি রবিবার রাত্রে "শ্রীজগন্নাথ সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের বহু সম্ভ্রান্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত।

নরেন্দ্র সরোবর।

কথিত আছে লাকপোসী নরেন্দ্র নামক পুরীরাজের জনৈক কর্ম্মচারীর ব্যয়ে এই সরোবর খনন করা হইয়াছিল, কিন্তু উৎকলের প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মিশ্র তর্কসাংখ্যন্যায়তীর্থ মহোদয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই সরোবর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য অবগত হইয়াছেন—

পুরীর নিকট 'রণপুর' নামক অর্দ্ধস্বাধীন করদরাজ্যের রাজাগণের উপাধি 'নরেন্দ্র'। এই রাজ্যের পূর্ব্বতন কোনও রাজা স্বীয় "শৌচ" নামক অন্তরঙ্গ ভৃত্যকে কোনও সময়ে কৌতুক ক্রমে একটীমাত্র 'বৃহতীর' (কুমড়া) বীজ দিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী উক্ত ভৃত্য সেই বীজটি স্বীয় ক্ষেত্রে বপন করিয়া যে ফলগুলি উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থ হইতে পুনরায়

বৎসর বৎসর বৃহতী চাষ ও ব্যবসায় হইতে বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া স্বীয় প্রভুকে সঞ্চিত অর্থ প্রদান করিয়া সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে অবগত করিলেন। রাজা নরেন্দ্র এই কৌতুকাবহ ঘটনার স্মারক স্বরূপ পুরীতীর্থে একটি স্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপন করিবার অনুমতি দিলেন। পুরুষোত্তমধামে জগন্নাথদেবের চন্দন যাত্রার জন্য একটী সরোবরের নিতান্ত আবশ্যকতা থাকায়, 'শৌচ' উক্ত সরোবর খনন করাইয়াছিলেন এবং যে অর্থের অভাব হইয়াছিল 'নরেন্দ্র' সংকুলান করিয়াছিলেন। সরোবর-প্রতিষ্ঠার সময়ে পুরীর রাজা এবং 'নরেন্দ্র' উপস্থিত থাকেন। এখনও নরেন্দ্রসরোবরের নাম 'নরেন্দ্র শৌচ' শুনা যায়।

সাক্ষীগোপাল।

পুরীর উৎকল মঠের স্বনামখ্যাত সাহিত্যানুরাগী আদর্শ মোহান্ত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণদাস গোস্বামী মহারাজ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন যে সাক্ষীগোপাল মূর্ত্তি প্রথমে কটকে, তৎপরে ক্রমান্বয়ে পুরীধামে, জটনির (খুর্দ্দারোড) নিকট রথীপুরে, চিল্কা হ্রদের অনতিদূরে ভূষণপুর গ্রামের সংলগ্ন কন্তলবাই নামক স্থানে স্থানান্তরিত হইয়া, অবশেষে বর্ত্তমান সত্যবাদী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

দোলযাত্রা।

বর্ত্তমান সময়ে স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে যেমন জগন্নাথদেবের দারুমূর্ত্তি বিরাজমান হইয়া থাকেন, পূর্ব্বে দোলযাত্রা উপলক্ষেও সেইরূপ হইতেন, কিন্তু খৃঃ ১৫৬০ অব্দে রাজা গোড়িয়া গোবিন্দদেবের রাজত্ব সময়ে দোলমঞ্চের কাষ্ঠ ভগ্ন হইয়া জগন্নাথদেবের দারুমূর্ত্তির অংশ বিশেষ ভগ্ন হইয়া যায়। তদবধি দেবের ভোগমূর্ত্তি মদনমোহন দোলমঞ্চে বিরাজমান হইয়া থাকেন।

মঠ।

পুরীধামে শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত চারিটী মঠ বিদ্যমান আছে। চারিজন সন্ন্যাসী উক্ত মঠ-চতুষ্টয়ের অধিকারী। অতি পূর্ব্বকালে জগন্নাথ মন্দিরের সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান কার্য্য শঙ্করাচার্য্য মতাবলম্বী সন্ন্যাসীগণের হস্তে ন্যস্ত

ছিল। সে সময়ে "ভোগ বৰ্দ্ধন পীঠ" নামে পুরীধামে শঙ্করাচার্য্যের একটিমাত্র সন্ন্যাসীমঠ ছিল। এক্ষণে যে "ভোগ মণ্ডপে" 'ছত্রভোগ' দেওয়া হয়, তাহাই উল্লিখিত সন্ন্যাসী পীঠ। কালক্রমে কোনও সময়ে সেই পীঠ সন্ন্যাসী-শূন্য হইলে কতকদিন তাহা সম্প্রদায় বিশেষের অধিকারভুক্ত হয় এবং সেই অবস্থায় তাহারা তথায় নানাবিধ অত্যাচার ও অনাচার করিতে থাকে। গঙ্গবংশীয় রাজা অনঙ্গভীমদেব তাহাদের কৃত কদাচার ব্যাপার দর্শন করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন এবং দক্ষিণ রামেশ্বর হইতে স্বামী বালব্রহ্মানন্দ সরস্বতীকে আনাইয়া মন্দিরের দক্ষিণে এবং সমুদ্রের উত্তরে "গোবৰ্দ্ধন পীঠে" তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বর্ত্তমানকালে ইহা 'শঙ্করানন্দ' মঠ নামে প্রখ্যাত। ইহাতে প্রত্যহ শতাধিক ব্রাহ্মণের শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজনের ব্যবস্থা আছে।

দক্ষিণপার্শ্ব মঠ। ইহার অন্য নাম শ্রীরামদাস মঠ। 'দার্ঢ্যতাভক্তি' গ্রন্থ লিখিত মণিরাম দাস ভক্তের মঠ বলিয়া ইহা খ্যাত। ভূসম্পত্তি প্রাচুর্য্য নিবন্ধন ইহা 'জমিদার মঠ' নামে প্রসিদ্ধ। মতান্তরে ইহাই রঘু অর্চ্চিতের মঠ।

এমার বা রাজগোপাল মঠ। ইহা মন্দিরের অগ্নিকোণে অবস্থিত। বর্ত্তমান মোহান্তর নামে শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর রামানুজদাস।

বড় উড়িয়া মঠ। গঙ্গবংশের শেষ রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজত্ব সময়ে ৺জগন্নাথদাস গোস্বামী কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। এই মঠে পুরীরাজ-প্রদত্ত বিস্তর 'অমৃত মণোহি' অর্থাৎ 'নাখিরাজ' সম্পত্তি আছে। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের অধিকাংশ সেবা ও পূজা ব্যাপার এই মঠের অধিকারীগণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। মঠের বর্ত্তমান অধিকারী পূজনীয় শ্রীরামকৃষ্ণ দাস গোস্বামী মহোদয় ব্রহ্মচর্য্যে, প্রতিভায়, দানে, মানে অসাধারণ ব্যক্তি। জনসাধারণের নিকট ইনি আচার্য্যের ন্যায় মহানুভব পুরুষ বলিয়া পরিগণিত। গবর্ণমেণ্ট তদীয় গুণবত্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জগন্নাথ বল্লভ মঠের অনৈক সভ্য নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-বিবৰ্দ্ধিনী সভার সভাপতি। সংযম-প্রাধান্যে এই প্রাতঃস্মরণীয় মোহান্ত-মহারাজ, বিদ্বান ও সাধুসজ্জনগণের সম্মানার্হ।

সংস্কৃত চতুষ্পাঠী।

১। পুরীধামে বলরামপুরের মহারাজ প্রতিষ্ঠিত একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে। ইহাতে রাজকীয় ভাণ্ডার হইতে সাহায্য প্রাপ্ত সাহিত্য ও ব্যাকরণ অধ্যাপনার্থ তিনজন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। ইহা ব্যতীত, ন্যায়, বেদান্ত ও স্মৃতি অধ্যাপনার জন্য তিনজন অধ্যাপক গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

২। **বেদ বিদ্যালয়।** ইহা মুক্তি মণ্ডপ সভা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাতে তিনজন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন।

৩। **শ্রীমুক্তি মণ্ডপ সনাতন কর্ম্মকাণ্ড বিদ্যালয়।** ইহা ক্রিয়া যোগ-প্রসারিণী সমিতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে দুইজন অধ্যাপক আছেন। এই বিদ্যালয়ের ন্যায়াধ্যাপক এবং রামকৃষ্ণচতুষ্পাঠীর দর্শন শাস্ত্রাধ্যাপক উৎকলের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র তর্কসাংখ্য ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়টি পরিচালিত হইয়া থাকে।

৪। **রঘুনন্দন চতুষ্পাঠী।** ইহা রাজগোপাল মঠের মোহান্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় পরিচালিত।

৫। **রামকৃষ্ণ চতুষ্পাঠী।** ইহা উড়িয়া মঠের অধিকারী বিদ্যানুরাগী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস গোস্বামী মহোদয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে দুইজন প্রখ্যাত-নামা অধ্যাপক অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

৬। **জগন্নাথ-বল্লভ চতুষ্পাঠী।** জগন্নাথ বল্লভ মঠ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত।

সম্পূর্ণ।

ভ্রম সংশোধন।

—:০:—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	স্থলে	হইবে।
৩	৪	মথুরা, বৃন্দাবন	... মথুরা-বৃন্দাবন।
৪	১৫	(১)	
	২৭	bequat	... bequest
৮	১০	কন্যায়	... কন্যার।
১২	১০	anient	... anicut.
১৪	২	দন	... দর্শন।
১৬	২৮	হওরায়	... হওয়ায়।
১৭	২০	দ্বীতিয়া	... দ্বিতীয়া।
	২৭	অনিয়ঙ্ক	... অনঙ্গ।
২০	৬	উদ্ঘটিত	... উদ্ঘাটিত।
২২	৭	একাদন	... একদিন।
২৪	১৮	ভাস্করেরশ্বর	... ভাস্করেশ্বর।
২৬	১৭	আরোহনে	... আরোহণে।
৩২	৬	নির্ম্মান	... নির্ম্মাণ।
৩৬	২২	মনি	... মণি।
৪০	২৭	তোমারও	... তোমরাও।
৪৯	১২	প্রমান	... প্রমাণ।
৫১	৭	নামক	... নাম।
৫৫	১৪,১৯,	অনিয়ঙ্ক	... অনঙ্গ।
৫৬	৫	অষ্টবিংশ	... দ্বাবিংশ।
৫৬	৪		মন্দিরের উচ্চতা ১২০ হস্ত
৫৬	১৮	৪৫০ হস্ত	... ৬৬৫ ফুট।
৫৬	১৮	ঐ	... ৬৪০ ফুট।
৬৬	২৬	সল্যভামা	... সত্যভামা

৬৯	২৬	স্নান	... স্থান।
৭২	২৮	শ্রমন	... শ্রমণ।
৭৩	৯,২০,	প্রত্যাবর্ত্তণ	... প্রত্তাবর্ত্তন।
৭৬	৭	এই সকল জাতির জন্য সিংহদ্বারের ভিতরে দক্ষিণদিকে পতিতপাবন জগন্নাথমূর্ত্তি বিরাজমান আছে।	
৯৩	১৮		মোট আয় প্রায় ১৷০ লক্ষ টাকা হইবে।
৯৩	২২	সহোদয়	... মহোদয়।
৯৪	১৮	কার্য্যে	... কার্য্য।
৯৪	২৩	অধ্যয়ণ	... অধ্যয়ন।
৯৪	২৭	প্রণয়ণ	... প্রণয়ন।
৯৪	২৮	শিরোমনি	... শিরোমণি।
৯৭	১৫	তিনি	... চৈতন্যদেব।
৯৯	৯	বল্লব	... পল্লব।
১০২	২৭	হা'	... হ'
১১১	১	তাঁহা অব	... তাঁহার অমার্জ্জনীয়।
১১১	২	অঙ্গন	... অঙ্গ।
১১১	১২	হহী	... হইতে।
১১৫	২৭	দদিণ	... দক্ষিণ।
১১৭	২৭	সংঙ্গা	... সংজ্ঞা।
১১৯	১	মনিদাস	... মণিদাস।
১২০	১৩	উপায়স্তর	... উপায়ান্তর।
	২০	পরিবেষণ	... পরিবেশন।
১৩০	২,৭	চুষ্য	... চূষ্য।
	২৩	অবদ্ধ	... আবদ্ধ।
১৩১	৩	উৎকলীর	... উৎকলীয়।
	৭	সেযে	... সে যে।